বিনিময়: পঞ্চাশ টাকা মাত্র

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত

ইমেজ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রংপুর

৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি চলছে

বিষয় সমূহঃ

- ডিপ্লোমা-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা-ইন-ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং
- ডিপ্লোমা-ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং

সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অব মেডিকেল টেকনোলজি রংপুর

৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-মেডিকেল টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি চলছে

বিষয় সমূহঃ

- ডিপ্লোমা-ইন-সিভিল প্যাথলজি
- ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং
- ডিপ্লোমা-ইন-ফার্মেসী
- ডিপ্লোমা-ইন-ডেন্টাল

বি.এস.সি ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সরাসরি পরিচালিত

ক্যাম্পাস পরিদর্শন করার পর ভর্তির সিদ্ধান্ত নিন।

ক্যাম্পাস ঠিকানা

বাসা নং-৪১, রোড নং-০১, নবাবগঞ্জবাজার রোড, মুন্সিপাড়া, রংপুর,
ফোন: ০১৭৫৫-০৬৭২১০, ০১৭৫৫-০৬৭২১১, ০১৭৫৫-০৬৭২১২
Website:imagerealestateltd.com,E-mail: imagerel@yahoo.com

■ গুনগুন ■ পুরোগ সংখ্যা-২০১১

গুনগুন

(একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

গুনগুন

একটি অনিয়মিত সাহিত্য পত্র

চতুর্থ সংখ্যা (পুরোগ ২০১১)

গুনগুন (একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন)
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এর
সাংস্কৃতিক আন্দোলনে প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠন
আলোর মিছিল
প্রণামেশু

গুনগুন
একটি অনিয়মিত সাহিত্য পত্র
চতুর্থ সংখ্যা (পুরোগ ২০১১)

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০১১, আশ্বিন ১৪১৮

সম্পাদক:
উমর ফারুক

সহযোগী সম্পাদক
আফিফা ইশরত চেতনা

সম্পাদনা পরিষদ :
আবু হুরাইরা রাকিব
তানজিমা হক
বিভূতী ভূষণ মাহাতো
মোঃ সোহানুল হক
মোঃ তৌহিদ নূর শাফি
নওরীন তাসনুমান
আল্পনা আকতার জাহান

কৃতজ্ঞতা:
প্রফেসর ড. সরিফা সালোয়া ডিনা
ড. মোঃ মতিউর রহমান

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : চেতনা

প্রচ্ছদ ডিজাইন : মিজান তালুকদার

মুদ্রণ: মুদ্রণ শৈলী, রংপুর। ০১৭১২০৫৭৪৩৭

প্রকাশনায়:
গুনগুন (একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন)
৪১৮, কবি হেয়াত মামুদ ভবন
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
Web Site: www.goongoon.yolasite.com
Email: faruque1712@gmail.com
মুঠো ফোন: ০১৭১৬৬০৭৯২৬, ০১৭২৬৮৬৪৮৯৮

কী কোথায়?

প্রবন্ধ

আখ্যানকাব্যে মধুসূদনের দেশপ্রেম / ড. নাজমুল হক ০৭
দায় / ড. মোঃ গাজী মাজহারুল আনোয়ার ০৯
রবীন্দ্র সাহিত্যে বাঁশি ও তরণী / প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম ১১
রবীন্দ্রনাথের ছড়া ভাবনা ও রবীন্দ্র ছড়া / শাশ্বত ভট্টাচার্য ১৫
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় হোক সকল ঐতিহ্যের উদাহরণ! / নিখিল চন্দ্র বর্মন ২০
শিশু ও শিশুশ্রম / সাদিয়া আরেফিন ঝিনুক ২২
শিশুর চোখে : বঙ্গবন্ধুর শৈশব / প্রজ্ঞা সিদ্দীক ২৩
নারী ও নারীর প্রতি অপদৃষ্টি / মোঃ তৌহিদ নূর শাফি ৪

কবিতা

সময় / সরিফা সালোয়া ভিনা ২৬
এ কেমন আশা তুলনাহীন / মোঃ ফেরদৌস রহমানা ২৬
বৃষ্টি / রিষিণ পরিমল ২৭
অন্তরালে / সাজিয়া আফরিন ২৭
ষড়-ঋতুর দেশ / মোঃ আতিউর রহমান ২৮
সাক্ষী শুধু রোদ্দুর / মাটি মুহাম্মদ ২৮
যদি ফিরে আসি / কায়সার আলম ২৯
দৃষ্টিভ্রম / সাদিয়া কাওছার ৩০
পল্লীর স্মৃতি / মোঃ শরিফুল ইসলাম ৩১
অতঃপর যখন জ্ঞানোদয় হয় / সুমন কুমার রায় (এস কে রায়) ৩১
Existence / Electra ৩২
Be kind to me / Pran Krishna Sarker ৩২

গল্প ও অন্যান্য

ক্যাম্পাস রঙ্গ / মোঃ মোরশেদ হোসেন ৩৩
নিজ গৃহে পরবাসী / অসীম সীমান্ত ৩৫
Trip to 'Vinno Jogot' 'Let's get missing somewhere' / Asif Al Matin ৩৭
বৃষ্টির ইতিহাস / আলী রায়হান সরকার ৩৮
বৃষ্টি দিনে অশ্রু ঝরে / মোঃ শাহ্‌জামান ৩৯
আমি একজন নারী বলছি / অংকন জাহান ৪১
একজন আধুনিক পণ্ডিতমশাইয়ের গল্প / জিনাত শারমিন ৪৩
উদ্‌ভ্রান্ত / শফিক আশরাফ ৪৫
হরতাল / আসমাউল হুসনা মনি ৫০
পরীর মা / আফিফা ইশরত চেতনা ৫১
অন্তঃ ক্ষরণ / আব্দুল্লাহ ৫৩
গুনগুন পরিবার ৫৫

সম্পাদকীয় নয়

সম্ভবত প্রাণ আর কম্পনের জন্ম যুগল।

জন্ম থেকেই ধক্ ধক্ করে হৃদপিণ্ডটা কাঁপছে। রিখটার স্কেলে তার মান জানা নেই। জননী হৃদ রোগে আক্রান্ত। মাঝে মাঝেই বলেন, দেখ্ বাবা আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করছে। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, জীবন্ত মানুষের বুক তো ধড়ফড় করবেই। সত্যি কথা বলতে কী, প্রিয়তমার আকুতিতে ভালোবাসার কম্পনের সংজ্ঞাও একদিন শিখেছিনু। প্রাণ নাকি কম্পনের মাধ্যমে তার অস্তিত্বের জানান দেয়। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ হঠাৎ কিছু জড় পদার্থ প্রাণ ফিরে পেল। আলীম স্যারের বই, কম্পিউটার, রমণীর প্রসাধনী, খোকাবাবুর খেলনা, বান্ধবীর ওড়না, মায়ের ছিকের হাড়ি সবাই এক সাথে প্রাণ ফিরে পেল। সারা দেশে শুরু হল দৌড় প্রতিযোগিতা। ঘর ছেড়ে সবার গন্তব্য বাহির। সন্ধ্যে সাতটা ছুঁই ছুঁই। প্রেস ক্লাব চত্বরের গল্প। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, চাকুরে, বেকার, নারী, শিশু, বৃদ্ধ সবাই। মালিকের গা ঘেষে দাঁড়িয়ে রইল কর্মচারী, প্যাজের থামিয়ে রিক্সাওয়ালার পাশে ধনকুবের, ছেঁড়া জামা পরা পুটুর দৃষ্টি চিলেকোঠায়, ধুতি পরা শ্রীমান অমল বাবু, পাশে মাগরিবের নামাজ পড়ে সদ্য বেরিয়ে আসা আব্দুল খালেক, সব কিছু কেমন যেন কেঁপে উঠল। প্লেট-টেলট জাতীয় কিছু একটা ব্যাখ্যা ভূ-তত্ত্ববিদরা সব সময়ই দিয়ে থাকেন। কিন্তু যে তত্ত্বই দেওয়া হোক না কেন বর্ণ, ধর্ম, জাতি নির্বিশেষে সকলকে এক কাতারে আনতে সক্ষম হয়েছে একটি কম্পন। নমস্য, হে ভূ-কম্পন তোমাকে। দু'মিনিট নয় একটি দীর্ঘস্থায়ী কম্পন পারে মানুষের মাঝে স্থায়ী সম্প্রীতি আনতে। প্রকম্পিত হোক বিবেক তাহলেই জাগ্রত হবে মানবতা।

কথা না রাখতে পারার দায় কাঁধে নিয়ে গুনগুন আলোর মুখ দেখলো। আমাদের সমালোচনা করুন কিন্তু আপনার সুস্থ কম্পন থেকে বঞ্চিত হতে চাই না। আপনাদের অসীম ভালোবাসা ও প্রত্যাশার কাছে আমাদের ক্রমাগত পরাজয় আর তাই আমরা জানি আপনারা গুনগুনের মানের প্রত্যাশা ভঙ্গের দায়ে আমাদেরকে অপরাধী করবেন। অবনত শিরে মানছি সে অপরাধ। লৌকিকতা নয় অন্তঃস্থ কৃতজ্ঞতা।

আপনাদের অনুযোগ পরম প্রত্যাশী।

উমর ফারুক

আখ্যানকাব্যে মধুসূদনের দেশপ্রেম

ড. নাজমুল হক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেরোবি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের মৌলিক কবি। উনিশ শতকের সদ্য ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মসচেতনতার যে উদ্বোধন ঘটে তিনি তার অন্যতম প্রতিনিধি। ডিরোজিওর যুক্তিবাদী প্রণোদনা ছিল তার প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা। রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমূখ মনীষীর শতসহস্র ব্যাপী অবরুদ্ধ ও ধর্মান্ধ সমাজ সংস্কার আন্দোলনের আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মধুসূদনের ভাবলোকে সমাজ ও দেশচেতার বীজ মুদ্রিত হয় স্থায়ী ভাবেই। সেই উর্বর মানস ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য মানবতাবাদী সাহিত্যের প্রবল অভিঘাত মাইকেলের ব্যক্তিচেতনাকে করে তোলে দেশ-সমাজ-জাতির কল্যাণ বোধে উদ্বুদ্ধ।

তবে একথা সত্য যে, কবিত্বের বিশুদ্ধ সাধনাই ছিল মাইকেলের প্রধান লক্ষ্য। দেশভাবনা তাঁর রচনায় এসেছে কাব্য চেতনার হাত ধরে। স্বদেশ প্রসঙ্গে কবি ঈশ্বর গুপ্ত বলেন:

জাননা কি জীব তুমি জননী জন্মভুমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে ॥

সমকালীন কবি রঙ্গলালের কাব্যেও দেশপ্রেম লক্ষণীয়। তাঁর বিখ্যাত উক্তি- 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়' ইত্যাদি অনুষঙ্গ ও দৃষ্টান্ত দেশচেতনার বাহ্যিক রূপ। মধুসূদনের কাব্যে এমন কড়া সুরের দেখা মেলে না। তিনি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' তাঁর স্বদেশ ও ভাষা বিষয়ে প্রগাঢ় অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। 'কপোতাক্ষ নদ' কবির চেতনায় 'দুগ্ধস্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে'। কিন্তু এমন উদাত্ত ঘোষণা অন্যত্র ধ্বনিত হয়নি। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' রাবণ একমাত্র ব্যতিক্রম। রাবণের বলশালী অনেক উক্তিই দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যেমন: প্রিয় বীরপুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ দেখে তার শোক জর্জরিত কিন্তু গৌরবময় উক্তি-

জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে, ভীরু, সে মূঢ়; শত ধিক তারে।

তাঁর এই উক্তিতে স্বদেশ চেতনাই শুধু প্রকাশিত হয়নি। দুর্বলচিত্তদের উদ্দেশে তিনি প্রবল ধিক্কার বাণীও উচ্চারণ করেছেন। যেমন করেছিলেন মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিম-

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে জন কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি ॥

বস্তুত দেশপ্রেমের প্রান্তিক দুটি রূপ লক্ষণীয়। এক পক্ষ দেশপ্রেমিক অপর পক্ষ দেশের অকল্যাণকারী অপশক্তি। তবে দুপক্ষই থাকে সক্রিয়। এ কারণে কাব্যস্রষ্টা থেকে দেশনেতা পর্যন্ত সকলেই দেশের কল্যাণের জন্য যেমন উদাত্ত আহ্বান জানান, একই সাথে প্রতিক্রিয়াশীল এবং বিশ্বাসঘাতকদের সম্পর্কেও সাবধান হতে বলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও এ ভূমিকাটি পালন করেছেন তাঁর সমগ্র কাব্য সাধনায়।

মাইকেলের স্বদেশ ভাবনায় উচ্চকিত রূপ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি মেঘনাদবধকাব্য। কিন্তু

তার রচিত খণ্ড কবিতায় যেমন, তেমনি 'মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য'- সকল ক্ষেত্রেই স্বদেশ চেতনার আন্তঃস্রোত প্রবাহিত হয়েছে।

মধুসূদনের 'তিলোত্তমা সম্ভার' প্রথম আখ্যানকাব্য। মহাভারতের একটি পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে এ কাব্যটি রচিত। এ কাব্য সুর ও অসুর বা দেবদৈত্যের সংগ্রাম সংঘর্ষের কাহিনী। সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই অসুর ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত ও স্বর্গচ্যুত দেবতারা ব্রহ্মার সাহায্যে অপরূপ লাবণ্যময়ী 'তিলোত্তমা' নামে এক নারী সৃষ্টি করেন এবং তাকে পাঠিয়ে দেন হিমালয় পর্বতের বিন্ধ্য কাননে। সেখানে সুন্দ-উপসুন্দ দুই ভাই একই সাথে রূপসী তিলোত্তমাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আত্মঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলাফল: উভয়ের মৃত্যু, দেবতাদের পুনরায় স্বর্গ অধিকার। গল্পটি পৌরাণিক। এ কাব্যে মানবিক রস একেবারেই অনুপস্থিত কিন্তু কেন্দ্রীয় ভাবনায় রাম-রাবণের সংঘর্ষ- সংগ্রামের রূপক প্রতীক অনুসৃত হয়েছে এখানেও। এ কাব্যে মধুসূদনের পক্ষপাতিত্ব দেবতার প্রতি নয়, নিরীহ কিন্তু বাহুবলে বলীয়ান মানব প্রতীম অসুরদের প্রতি, যেমনটি সমর্থন দিয়েছেন মেঘনাদবধ কাব্যে। দেবতাদের তিনি হীন চরিত্র, প্রতারক ও কাপুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এটি দেশ ও জাতির প্রতি মাইকেলের সুস্পষ্ট প্রেম ও আনুগত্যের লক্ষণ।

'বীরাঙ্গনা' মধুসূদন দত্তের অপর বিখ্যাত কাব্য। এ কাব্যে কাহিনী বা 'Dramatic Monologue' বিদ্যমান থাকলেও স্থান পায়নি ধারাবাহিক আখ্যান। এ কাব্যের কাহিনী খণ্ডচিত্র মাত্র। সেদিক থেকে 'বীরাঙ্গনা' আখ্যান কাব্য নয়। ইতালীয় কবি ওভিদের হিরোইদস্ কাব্যের আদর্শে এ কাব্যে গ্রথিত হয়েছে এগারটি পত্র। বিভিন্ন পৌরাণিক গল্প ও কাব্য থেকে চয়নকৃত শকুন্তলা, কেকয়ী, দ্রৌপদী, ভানুমতী, দুঃশলা, সূর্পণখা, উর্বশী, প্রমূখ এগারজন বিরহকাতর নারীর জীবনের বহু বিচিত্র মানস বিকলন চিত্র স্থান পেয়েছে এ কাব্যে। কোমল-কঠোর, সরল-তীর্যক, নম্র-বিষণ্ন, প্রেমময়ী, ইন্দ্রিয় পরায়ণ রমণী হৃদয়ের তৃষ্ণা, হতাশা, ক্ষোভ, যন্ত্রণা ও আকাঙ্ক্ষার প্রদীপ্ত দর্পণ 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। এ কাব্যের মূল সুর মানবিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মূল্যবোধ ও রক্তমাংসের মানুষের জয়গান। মানুষের প্রতি মমত্ববোধই তো দেশপ্রেমের সর্বাপেক্ষা মহৎ লক্ষণ।

বস্তুত, মাইকেল মধুসূদনের স্বদেশ চেতনা তাঁর কাব্যের প্রগাঢ় অস্তিত্বে যতটা অন্তঃসলিলা রূপে বিদ্যমান, বাহ্যরূপে ততটা প্রকটিত নয়। কিন্তু সর্বতোভাবেই তিনি মানবতাবাদী ও স্বদেশ চেতনার একজন মহৎ কবি।

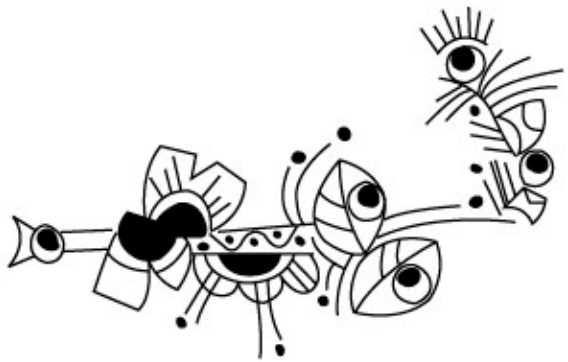

দায়

ড. মোঃ গাজী মাজহারুল আনোয়ার
শিক্ষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, বেরোবি

একটি রাষ্ট্রের গড়ে ওঠার সময়কাল সুনির্দিষ্ট নয়। দীর্ঘ সময় ধরে, অসংখ্য মানুষের প্রচেষ্টায়, অনেক সাধারণ মানুষের সাধারণ কর্মকাণ্ডে, অনেক কর্মঠ মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে, অনেক চিন্তাশীল মানুষের বিচ্ছিন্ন গভীর ভাবনায়, অনেক দেশপ্রেমিকের নিরবিচ্ছিন্ন ভালবাসায় একটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। বাংলাদেশ নামক ক্ষুদ্র অথচ সম্ভাবনাময় রাষ্ট্রটি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এর অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী আদৌ এগিয়েছে নাকি পিছিয়ে পড়ছে, তা আজ বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সভ্যতার ইতিহাসে চল্লিশ বছর খুব বেশী সময় না হলেও এই সময়কালে বাংলাদেশ সভ্য রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথে কতটা পথ অতিক্রম করেছে বা সে পথে সত্যি সত্যি চলছে কিনা, তাও আজ প্রশ্ন সাপেক্ষ।

রাজনীতি একটি রাষ্ট্রের প্রাণ। গণতান্ত্রিক রাজনীতির সৌন্দর্যই হচ্ছে একাধিক মতাদর্শের মানুষের দেশের প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসা বজায় রেখে পরিশীলিত আচরণের মাধ্যমে নিজ নিজ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে কাজ করে যাওয়া। সহনশীলতা যেখানে অপরিহার্য গুণ। দুঃখজনকভাবে, বাংলাদেশের রাজনীতি সেই পথ হারিয়ে ফেলেছে যার প্রতিফলন আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরে আমরা দেখতে পাই। রাজনীতিতে মেধাহীনতা বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং এই ব্যর্থতাই সভ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশ যদি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে ব্যর্থ হয়, তার দায়-দায়িত্ব রাজনীতি এবং রাজনীতিবিদদের নিতে হবে।

আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালিত হয় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দ্বারা। অশিক্ষিত বা পিছিয়ে পড়া মানুষের রাষ্ট্র পরিচালনায় কোন ভূমিকা নেই। শিক্ষিত এইসব মানুষের সমন্বিত কর্মযজ্ঞে একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সমসাময়িককালের সকল রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসায়, শিল্প, ও মিডিয়া, সবখানেই শিক্ষিত মানুষের সদম্ভ বিচরণ, অশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত মানুষের এসকল প্রতিষ্ঠানে কোন ভূমিকা নেই। আধুনিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উপর্যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। সভ্য ও আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হলে তার সকল দায়-দায়িত্ব শিক্ষিত জনগোষ্ঠিকেই নিতে হবে। অনগ্রসর, অশিক্ষিত, পিছিয়ে থাকা মানুষগুলো এক্ষেত্রে দায়মুক্ত।

লেখার এই অংশে যে 'বুদ্ধিজীবী'র কথা উল্লেখ করা হচ্ছে – তা সাধারণ অর্থে, প্রচলিত অর্থে বুদ্ধিজীবি বা `Intellectual'। এর সংজ্ঞা বা প্রকারভেদের মত আলোচনা বা মতামত এখানে বিবেচনা করা হচ্ছে না, শুধুমাত্র বুদ্ধিজীবীর কাজের কিছু ধরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। দার্শনিক গ্রামসি তার Prison Notebooks-এ লেখেন, 'সব মানুষই বুদ্ধিজীবী একথা প্রত্যেকেই বলতে পারে কিন্তু সমাজে সব মানুষ বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করে না।' অর্থাৎ সমাজে কিছুসংখ্যক মানুষ বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। বুদ্ধির নিজস্ব একটা দায় আছে, সে দায় অনেক বেশী, অনেক ঋদ্ধ। আইনস্টাইন তাঁর এক নিবন্ধে লিখেছেন, 'A hundred times every day I remind myself that my inner and outer life are based on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving...'। বুদ্ধিজীবির পরিচয় বলতে গিয়ে এডওয়ার্ড সাঈদ বলেন, 'একজন বুদ্ধিজীবি সেই মানুষ সমাজে যার ভূমিকা আছে। তিনি কোনো নামগোত্রহীন পেশাজীবি নন, যিনি সমাজের একজন বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রতিদিন তাঁর বাঁধাধরা কাজে যান আর আসেন।' সাঈদের মতে, বুদ্ধিজীবি হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি জনগণের প্রতি ও জনগণের জন্য সোচ্চার এবং মতামত, মনোভাব, উপস্থাপন ও গ্রন্থিবদ্ধ করতে

বদ্ধপরিকর। বিনয় ঘোষের বর্ণনায়, 'মহাবিদ্বান কেউ যদি জ্ঞানসমুদ্রে ডুব দিয়ে তলিয়ে থাকেন এবং কেবল ভুড়ভুড়ি কাটেন, যদি তাকে দেখা না যায়, তার চিন্তা ভাবনার কথা জানা না যায় তাহলে জ্ঞানতপস্বী স্কলার হলেও সামাজিক অর্থে বুদ্ধিজীবি নন।' তার অর্থ একজন বুদ্ধিজীবী সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ করবেন এবং সমাজে তাঁর প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থান থাকতে হবে। যদি তাঁর এই ভূমিকা না থাকে তবে তিনি উচ্চশিক্ষিত হলেও বুদ্ধিজীবী নন।

সাধারণ ভাবনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে সমাজ পেশাগত কারণেই বুদ্ধিজীবির ভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত। সমাজের সকল শৃঙ্খল ভেঙে পড়লে মানুষ এই শ্রেণীটির কাছে স্বপ্ন দেখার সাহস চায়। যখন কোন একটি জাতি বা সমাজ নানামুখী ব্যাপক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়ে তখন বুদ্ধিজীবী তাঁর বিবেকের প্রভাব ছড়িয়ে দেবেন অন্যদের উপর, তাদেরকে উদ্দীপ্ত করবেন অবয়ের বিরুদ্ধে, ভালত্বের দিকে।

উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠিকে কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জীবনের একটা দীর্ঘ সময় সংশ্লিষ্ট থাকতে হয়। এই সময়কালের শুরু অফুরন্ত স্বপ্ন নিয়ে, যার পরবর্তী অংশে তারা, এমনকি রাজনীতিবিদরাও, শিক্ষকদের সংস্পর্শে থাকেন এবং তাঁদের চিন্তা ও কাজকর্ম দ্বারা প্রভাবিত হন। আজকের বাংলাদেশের নীতিহীন রাজনীতিবিদ, বড় ও ছোট দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, শেয়ার বাজারের অর্থ আত্মসাৎকারী, শ্রমিকের রক্তচোষা শিল্পমালিক - এদের প্রায় সকলেই কোনো না কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলেন। শিক্ষার্থীরা যখন কোন ভালো কাজ করে, তখন শিক্ষক অহংকারবোধ করেন। একইভাবে, এসব নষ্ট মানুষের নষ্ট কাজকর্মের দায় তাত্ত্বিকভাবে, শিক্ষকদেরকেই নিতে হয়।

পৃথিবীর সবদেশেই, এমনকি বাংলাদেশেও (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ মেধাবি শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। মেধাবি ঐ ব্যক্তিদের কাছে সমাজের চাহিদাও অনেক বেশী। তাঁদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট সময়টা অতিবাহিত করেন, শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। শিক্ষকদের মেধা, প্রজ্ঞা, প্রমা, দক্ষতা, ও স্বপ্নকে সর্বাত্মকভাবে বিকশিত হওয়ার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব। সুতরাং, শিক্ষিত জনগোষ্ঠির জীবন-দর্শন গঠনের দায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এড়াতে পারেন না।

রবীন্দ্র সাহিত্যে বাঁশি ও তরণী

প্রফেসর মোহাম্মদ শাহ আলম
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর

রবীন্দ্র প্রতিভা বিরাট আর বিচিত্র সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ। তার সাহিত্য ভাণ্ডারে মেলে নব নব সৌন্দর্যের চিত্র, শোনা যায় অজানা সুন্দরের বাঁশি। বিশ্ব প্রকৃতি, মানব ও ভগবানের পরস্পর সম্পর্কের কথাও উজ্জ্বল। রবীন্দ্র প্রতিভা যেমন বহুমূখী তেমনি তার শব্দ ভাণ্ডারও বিচিত্র। জীবন যাপন সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় যেমন- পালকি, ঘোড়া, বেণু, জাহাজ, স্টিমার, স্থান দিয়েছেন সাহিত্যে।

অন্যান্য অনেক শব্দের মত- বাঁশি এবং তরণী রবীন্দ্র সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বে ঠাঁই পেয়েছে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গানে শব্দ দুটো বিশেষ দোতনা সৃষ্টি করেছে। বাঁশি শুধু বাঁশি থাকেনি কবিতায়- রূপক ধারায় গভীর অর্থে আলোচিত। প্রশ্ন তোলা; পুরাতন, গীতোচ্ছ্বাস, ভুল ভাঙা, উপহার, বাঁশি, বাঁশিওয়ালা, খেলাভেদীসহ আরও অনেক কবিতায় বাঁশির প্রসঙ্গ এনেছেন রবীন্দ্রনাথ।

কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে রাধার হৃদয়ের ব্যাকুলতার কথা আছে মধ্যযুগের সাহিত্যে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর প্রশ্ন কবিতায় রাধার মত অন্তর্জাত আকুলতা প্রসঙ্গে বাঁশির উপস্থাপন-

বাঁশরি ধ্বনি তুহ অমিয় গরল রে
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরণরে;

বাঁশি নতুনের ডাক দিয়ে যায়। বাঁশির শব্দে বসন্ত আসে। পুরাতনকে দূরে সরিয়ে বাঁশি শোনায় হাসি, আনন্দের গান-

হেথা হতে যাও পুরাতন,
হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে
আবার বাজিছে বাঁশি আবার উঠেছে হাসি
বসন্তের বাতাস বয়েছে।

বাঁশির সুর প্রিয়ার নব বারতার মতো-

নীরব বাঁশিখানি বেজেছে আবার
প্রিয়ার বারতা বুঝি এসেছে আমার।

বাঁশি অনেক কথা বলে কোন কথা না বলে। বাঁশির যে অস্পষ্টতা তা জানার প্রত্যয় প্রিয়জনের কাছে-

ওগো ভাল করে বলে যাও
বাঁশরি বাজায়ে যে কথা জানাতে
সে কথা বুঝায়ে দাও।

বাঁশি কবিতার বাঁশি সমতাসূত্রে রাধার বিশেষ অবলম্বন। এ গদ্য কবিতায় ধনী গরীবের যে ব্যাবধান তা ঘুচিয়ে দিয়েছে বাঁশির চিরন্তন করুণ এ প্রস্থানের ডাক, এ বাঁশি আত্মবিশ্বাসেরও

বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে।

বাঁশিওয়ালা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একজন ত্রাতা হিসেবে বাঁশিওয়ালাকে চিত্রিত করেছেন। যিনি বাঁশির সুরে স্বপ্নহারা বঞ্চিত এক মেয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হবেন।

ওগো বাঁশিওয়ালা
বাজাও তোমার বাঁশি
শুনি আমার নতুন নামে-
.....
তোমার ডাক শুনে একদিন
ঘরপোষা নির্জীব মেয়ে
অন্ধকার কোণ থেকে
বেরিয়ে এল ঘোমটা খোলা নারী।

রবীন্দ্র ছোট গল্পে বাঁশির প্রসঙ্গ এসেছে স্বল্প অবয়বে। জয়-পরাজয় নামের গল্পে শেখর চরিত্রের মাধ্যমে বাঁশি উপস্থাপিত। শেখর গানে গানে বাঁশির কথা জানান দেন-

বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে
তখনো গোপিনীরা জানেনা কে বাজাইল।

এ বাঁশির সুরে অন্তরে যে ব্যাকুলতা তার বিবরণ- মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল, মনে হইল আকাশের প্রত্যেক তারা যেন বাঁশির ছিদ্র, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্বত্র বাজিতে লাগিল- বাঁশি কী বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিলনা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে তরণী শব্দটি নানা চিন্তার বিস্তারে ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু তরণী নয় সমার্থক তরী, নৌকা, ডিঙ্গি এমন নামও আছে। তাঁর সিন্ধু তরঙ্গ, সোনারতরী, দিনশেষে, পরিশোধ, প্রতীক্ষা, বেলাশেষে, চঞ্চলা, সহযাত্রী, চির আমি, নতুনদেশ প্রভৃতি কবিতায় 'তরণী' প্রসঙ্গ আছে।

সিন্ধু তরঙ্গ কবিতায় তরঙ্গক্ষুব্ধ উদ্দাম সিন্ধুর কাছে 'তরণী' নিতান্তই অসহায়। রাক্ষসী ঝটিকা তরণীকে কাছে নিতে চায়-

তরণী ধরিয়া ঝাঁকে রাসী ঝটিকা হাঁকে
দাও দাও দাও।

সিন্ধুর হিংস্র উতরোল তরঙ্গে ছোট্ট তরণী অস্তিত্ব রা করতে পারে না।-

ফেটেছে তরণী তল সবেগে উঠিছে জল
সিন্ধু মেলে গ্রাস।

'সোনারতরী' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম আলোচিত ও বিখ্যাত কবিতা। রূপক এ কবিতায় 'তরণী' তাত্ত্বিকতার রঙে রাঙানো। তরী বোঝাই নিবন্ধে কবি নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন, মানুষ সমস্ত জীবন ধরে ফসল চাষ করছে। সমস্ত কর্মের নিত্য ফল তা সে ঐ সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে.....কিন্তু যখন মানুষ বলে ঐ সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো, তখন সংসার বলে, তোমার জন্য জায়গা কোথায়? সোনার তরী কবিতায় কবির অভিব্যক্তি-

যত চাও তত লও তরণী পরে
আর আছে? আর নাই দিয়েছি ভরে।
.....
এখন আমারে লহ করুণা করে।
ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

নতুন দেশে বঞ্চিত কোন নারীকে পাবার জন্য তরণী ঘাটে বেঁধে অপেক্ষার প্রহর গোনার কথা বহু 'দিন শেষে' কবিতায়

দিন শেষ হয়ে এল আঁধারিল ধরণী
আর কাজ নেই বেয়ে তরণী।
হ্যাঁ গো এ কাদের দেশে বিদেশী নামিনু এসে
তাহারে শুধানু হেসে যেমনি
আমরি কথা না বলি ভরাই ছিল ছল ছল
নত মুখে গেল চলি তরুণী
এ ঘাটে বাঁধিব মোর তরণী।

অরূপ রতন আশা করে রূপ সাগারে ডুব দিয়েছেন কবি। তাই অরূপ রতন কবিতায় ঘাটে ঘাটে তরী নিয়ে ঘোর আগ্রহ নেই-

'রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি অরূপ রতন
আশা করি
ঘাটে ঘাটে ঘুরবনা আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।

এক তরীতে প্রিয়জনসহ অকারণে ভেসে যাবার আনন্দই আলাদা। কেউ জানবেনা কোথায় কোন দেশে তরী নিয়ে যাচ্ছেন তারা। সহযাত্রী কবিতায় আছে-

'কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি
যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে
ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
কোথায় যেতেছি কোন দেশে কোন সে দেশে

বাঁশিওয়ালা কবিতায় বাঁশি ও নৌকা দুই ব্যবহার ল্যযোগ্য। অধিকার প্রত্যাশী নারীর হতাশাজনক অভিব্যক্তি-

'আমাকে তুলে দেননি এ যুগের পারনি নৌকায়
অন্য আটক করে ফেলে রেখেছেন।
সময় কাটানোর সময়ের অনুভব-
বসে থাকি জোয়ারের জলের দিকে চেয়ে
ভেসে যায় মুক্তি পারের খেয়া
ভেসে যায় ধনপতির ডিঙা।

অন্যত্র,

যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
বাইবনা মোর খেয়াতরী এই ঘাটে।

চিরন্তন সত্যের স্বীকৃতি-

ঘাটে ঘাটে খেয়া তরী এমনি সেদিন উঠবে ভরি
চরবে গরু খেলবে রাখাল ওই মাঠে।

গল্প উপন্যাস এবং প্রবন্ধে তরণী প্রসঙ্গ এসেছে বিশেষ গুরুত্বের সাথে। একটা আষাঢ়ের গল্প, ছুটি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, আপদ, অতিথি প্রভৃতি গল্পে নৌকা, নদী, বর্ষার বিবরণ মেলে। সদাগরদের

বাণিজ্য সম্পর্কে নৌকার সুন্দর বিবরণ–

'নৌকাগুলো রাজপুত্রের হৃদয় বাসনার মতো ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খদ্বীপে গিয়া এক নৌকা শঙ্খ, চন্দনদ্বীপে গিয়া চন্দন, প্রবালদ্বীপে গিয়া এক নৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

এরপর বিপর্যয় আর নৌকাডুবির চিত্র আর চারিটি নৌকা পূর্ণ হইল তখন সহসা একটা বিপর্যয় ঝড় আসিল। সব কটা নৌকা ডুবিল কেবল একটি নৌকা তিনবন্ধুকে একটা দ্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান খান হইয়া গেল।' ছুটি গল্পে ফটিক অর্ধনিমগ্ন নৌকার গুলুইয়ে চড়ে কাশের গোড়া চিবায় এ দৃশ্য আছে। মৃন্ময়ী বাবার কাছে যাবার সময় সমাপ্তি গল্পে নৌকা প্রসঙ্গ-মৃন্ময়ী নৌকায় উঠিল। মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মৃন্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার প্রশ্ন করিতে লগিল। এ নৌকায় কী আছে উহারা কোথা হইতে আসিয়াছে। পরদিন সন্ধ্যাবেলা নৌকা কুশীগুন্নে গিয়া পৌছিল।

রাজর্ষি, নৌকাডুবি উপন্যাসে নৌকা প্রসঙ্গ এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। রাজর্ষিতে নক্ষত্র রায় নদীতীরে গিয়ে দেখলেন 'উপস্থিত হইয়া নক্ষত্র রায় দেখিলেন কাঁধে গামছা ফেলিয়া পীতাম্ব স্নান করিতে আসিতেছেন। নক্ষত্র রায় ও রঘুপতি নৌকায় উঠিলেন। নৌকা দক্ষিণমুখে চলিয়া গেল।

নৌকাডুবি উপন্যাসে কাহিনীর দ্বান্দ্বিকতা সৃষ্টি নৌকাডুবির কারণে।

সকাল বেলা জেরা ভিঙির সাদা সাদা পালে নদী খচিত হইয়া উঠিল। গ্রামের ঘাটের কাছে নৌকা পৌছিতেই রমেশ খবর পাইল যে তাহার পিতার শাশুড়ির ও আর ফাকাই আত্মীয় বন্ধুর মৃতদেহ নদী হইতে পুলিশ উদ্ধার করিয়াছে।

একটা ঘূর্ণা হাওয়া একটি সংকীর্ণ পথ মাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবল বেগে সমস্ত উন্মুলিত বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া নৌকা কোথা থেকে কোথায় কী করিল, তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না।

সরোজিনী প্রয়াণ, শরৎসহ আরও কিছু প্রবন্ধে নৌকা বিষয়ক বিবরণ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ছোট নৌকা থেকে জাহাজে ওঠা এবং নামার বাস্তব দৃশ্য চিত্রায়িত সরোজিনী প্রয়াণ প্রবন্ধের কিছু অংশে-

'গঙ্গার ধারে কয়লা ঘাটে গিয়ে পৌছানো গেল। সম্মুখ হইতে ছাউনি-ওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলো দৈত্যের পায়ের মাপে বড় বড় চটি জুতার মতো দেখাইতেছে।

নৌকার মধ্যে গিয়া পরিলাম। পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। ছোট ছোট নৌকাগুলি আজ পাল ফুলাইয়া ভারি তেজে চলিয়াছে।' শরৎ প্রবন্ধে এর সাথে ছিপ নৌকার তুলনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ছেলেদের হাসি কান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মত ছুটিয়া চলে, তাতে মাল বোঝাই নাই।

রবীন্দ্র জীবনে পদ্মার প্রভাব ব্যাপক। পদ্মার বুকে নিজেই ভেসেছেন বোটে, দৃষ্টিতে ছিল অসংখ্য নৌকা। ছিন্নপত্রসহ কিছু চিঠিতে নৌ-বিবরণ রীতিমত সাহিত্যের খোরাক। বাঁশী এবং তরণী সাধারণ বস্তুমাত্র। কিন্তু রবীন্দ্র চৈতন্যে যা অসাধারণে ভাস্বর। অন্তত পাঠকের কাছে তিনি সে বোধ সঞ্চার করতে পেরেছেন সাফল্যের সাথে।

রবীন্দ্রনাথের ছড়া ভাবনা ও রবীন্দ্র ছড়া

শাশ্বত ভট্টাচার্য

ঠাকুরবাড়ির সংস্কৃতি চর্চা রবীন্দ্রমানসের ভিত্তি দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ হয়ে পরবর্তী বিকাশ, বোধলগ্নতার সময়কাল থেকে পারিবারিক চর্চা কাজ করেছিল। শিকড়ে সেচন করেছিল অমৃতবারি। সেই সব চর্চায়, ঠাকুরবাড়িতে, অনেকটাই ঐতিহ্যমগ্নতা, ফিরে দেখবার প্রবল আগ্রহ। কিন্তু প্রাচীনে-পুরাণে আত্মলোপ নয়, বরং আত্মআবিষ্কারই ঠাকুরবাড়ির ধীমানদের ডুবিয়ে রেখেছিল। এসব রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন, বুঝেছেন এবং তাতে মগ্ন হবার জন্য নিজ মানস নির্মাণ করেছেন। আর সে কারণেই নাগরিক রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ চিরায়ত অকৃত্রিম সাংস্কৃতিক উপাদানকে দূরে সরিয়ে তাঁর চর্চাকে বেগবান করতে চাননি। উনবিংশ শতাব্দিতে শিক্ষিত সম্প্রদায় যাত্রা করেছিল গ্রাম থেকে শহরের দিকে কিন্তু বিষয়টি আমলে নিলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ এ চলনের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন। অর্থাৎ শহর থেকে গ্রামের দিকেই যাত্রা করেছেন। দেশের মূল হৃদস্পন্দন যে গ্রামেই সে বিষয় স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। শুধু উপলব্ধি নয় যারা স্পন্দন জাগায় তাদের অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ মানুষদের, আলোহীন জীবন থেকে উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন কর্ম পরিকল্পনাও নিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের গ্রাম ভাবনায় শুধুমাত্র গ্রামীণ মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নতির কথাই প্রাধান্য পায়নি বরং সেখানে সাংস্কৃতিক বিকাশের বিষয়টিও অন্যতম কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এটি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয় তার নাড়িস্পন্দনেই অর্থাৎ সংস্কৃতিতে একথা উপলব্ধি করেছিলেন বলেই লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে আত্মনির্মাণ ও আত্ম-আবিষ্কারের পথ খুঁজেছিলেন। পথ পেয়েওছিলেন। আজ বহু হিসেব-নিকেশের পর আমরা অনুধাবন করি যে ঐতিহ্য বিচ্ছিন্ন কোন সৃষ্টিই শাশ্বত হতে পারেনা । যে কারণে তিরশের কাব্য আন্দোলন নিয়ে আমরা এখন দ্বিধায় ভুগি। একমাত্র জীবনান্দ দাশকে সরিয়ে নিলে বাকী সবটাই শিকড়হীন বৃক্ষ মনে হয়। একারণেই আজ, নতুনরা পুনরায় পথ খুঁজেছেন। খুঁজেছেন ঐতিহ্যর মাঝেই। এই পথ পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথই প্রথম। লোকায়ত সংস্কৃতির গভীর ধ্যানই তাকে রাস্তা দিয়েছিল। আউল-বাউল-বৈরাগী সবই মন্থন করে তার সৃষ্টিকর্মের রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। গানে নাটকে কবিতায় তুলে এনেছেন লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান।

খুলে দেখ দ্বার অন্তরে তার আনন্দ নিকেতন

গ্রামবাসী রবীন্দ্রনাথ, যখন শিলাইদহে তখন লোকছড়া সংগ্রহে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। সংগৃহীত ছড়াগুলি নিয়ে 'সাধনা' পত্রিকায়, ১৩০১-লিখেছিলেন প্রবন্ধ 'মেয়েলি ছড়া'। পরে লোকসাহিত্য গ্রন্থে ছেলে ভুলানো ছড়া নামে ছাপা হয়েছিল। এই প্রবন্ধটিই বাংলায় লোকছড়া বিষয়ক প্রথম বিজ্ঞানমনোস্ক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথই প্রথম গবেষক যিনি লোকসংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। এগুলো যে নিছক মনোরঞ্জনের জন্য নয় বরং এসবের মাঝে একটি জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পরিচয় বর্তমান তা তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন এর চিরত্বের দিকটিকেও-এই সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনটির কোন কালে রচিয়তা ছিল বলেও পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন সনের কোন তারিখে কোনটি রচিত হয়েছিল এমন প্রশ্ন কারো মনে উদয় হয়না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে তারা আজ রচিত হলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হলেও নতুন। অর্থাৎ পুরাতন হয় নতুন পুনরায়। এই পুরাতনের মাঝেই নতুনের অন্বেষণ রবীন্দ্রচেতনার মর্মে প্রবাহিত হয়েছিল। হয়েছিল বলেই গ্রামবাসি রবীন্দ্রনাথ দ্বার খুলে খুলে অন্বেষণ করেছিলেন আনন্দ নিকেতনের। অন্বেষণ করেছিলেন ঐতিহ্যর স্পন্দন। এই স্পন্দনকেই নবরূপে প্রকাশ করেছিলেন।

গোড়াতেই বলে নেওয়া ভাল, রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে নাট্যকার,গল্পকার, প্রবন্ধকার, চিত্রকর, গীতিকার সে অর্থে তিনি ছড়াকার নন। তবে লৌকিক ছন্দ যে তার চিত্তকে দুলিয়েছিল সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত এবং বিভিন্ন কবিতায় এ ছন্দের তিনি সার্থক প্রয়োগও ঘটিয়েছেন। এবিষয়ে তার স্বীকারোক্তি উদ্ধারযোগ্য- 'বাংলার অসাধু ভাষাটা খুব জোরাল ভাষা এবং তাহার চেহারা বলিয়া একটা পদার্থ আছে। আমাদের সাধু ভাষার কাব্যে এই অসাধু ভাষাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয় নাই।... সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলাদেশের ছড়ায় চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করে আছে। কেবল ছাপার কালির তিলক পারে সে ভদ্র সাহিত্যসভায় মোড়লি করে বেড়াতে পারে না। কিন্তু তার কণ্ঠে গান থামে নাই, তার বাঁশের বাঁশি বাঁজছেই। সেইসব মেঠো গানের ঝর্ণার তলায় বাংলা ভাষার হসন্ত শব্দগুলো নুড়ির মতো পরস্পরের উপর পড়ে ঠুনঠুন শব্দ করছে। আমাদের ভদ্রসাহিত্যপল্লীর গন্ডীর দিঘীটার স্থির জলে সেই হসন্তের ঝঙ্কার বদ্ধ। আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলায় এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করেছি।' এই কথাগুলি যখন ছাপা হয় তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স তিপান্ন (সবুজ পত্র ১৩২১)। এ সময়ে শেষ কাব্য বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ক্ষণিকা, শিশু, উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এই সব কাব্যগুলি। এগুলির বিভিন্ন কবিতায় তিনি চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগিয়েছিলেন। তবে এরও আগে 'সোনার তরী', মানসীর বিভিন্ন কবিতায় লোকছন্দের ব্যবহার আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমন-

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুইন!
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন। [দুরন্ত আশা/ মানসী]

অথবা,

সকালবেলা কাটিয়া গেল
বিকাল নাহি যায়।
দিনের শেষে শ্রান্তছবি
কিছুতে যেতে চায়না রবি,
চাহিয়া থাকে ধরণী পানে,
বিদায় নাহি চায়। [অপেক্ষা/ মানসী]

অথবা,

খসিয়া পড়া আঁচলখানি
বক্ষে তুলি দিল।
আপন-পানে নেহারি চেয়ে
শরমে শিহরিল। [সুপ্তোত্থিতা/ সোনার তরী]

তবে এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন ছড়ার মূল বৈশিষ্ট্য ধারণ করেননি। ছড়ার মূল বৈশিষ্ট্য কী তা আমরা রবীন্দ্রভাষ্যে জেনে নিতে পারি-

ক) ছড়ার একটা স্বতন্ত্র রাজ্য আছে, সেখানে কোন আইন কানুন নেই। [ছিন্ন পত্রাবলী, পত্র-১৪৮]

খ) ... ছড়াও কালবিচারশাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভাল করিয়া ধরা দেয় নাই।... ছড়াগুলিও ভারহীনতা, অর্থবন্ধনশূণ্যতা এবং চিত্র-বৈচিত্র্য বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের

মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে- শিশুমনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই। [লোকসাহিত্য]

এইসব বৈশিষ্ট্যের আভাস অথবা পূর্ণতার পরিচয় পেতে হলে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গ্রন্থের প্রতি নজর দিতে হবে। গ্রন্থ তিনটি হলো 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' ও 'খাপছাড়া'। শিশু কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯০৩-এ। এর কবিতাগুলি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় দুটি চিঠিতে। একটি লিখেছেন, 'আমি আজকাল শিশুদের মনের ভিতরে বাস করে আছি। তেতলার ছাদের উপর আমার নিজের শৈশব মনে পড়ছে।' [পত্রাবলী-১৫] আরেকটিতে লিখেছেন, 'যতই লিখছি নিজের ভেতরে যে বালকাণ্ড আছে তার সঙ্গে পরিচয় ততই বেড়ে যাচ্ছে।' [পত্রাবলী-২৮] চিঠির এই সব ভাষাই পদ্যাকারে প্রকাশ পেয়েছে-

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি বাসা নিতে-
তবে আমি একবার
জগতের পানে তার
চেয়ে দেখি বসি তার নিভৃতে।

খোকার মনের মাঝখানটিতে বসে যা রচনা করলেন তা লোকছড়ার বৈশিষ্ট্য ছুঁতে চাইল। পুরোপুরি পারল না। তার নিজেরও দ্বিধা ছিল। 'জগত পারাবারের তীরে' শিশুর যে 'মহামেলা' সেই শিশুদের জন্য প্রকৃত লেখা সম্ভব হয়নি বলেই 'সমালোচক' খোকা মাকে বলছে-

বাবা নাকি বই লেখে সব নিজে।
কিছুই বোঝা যায় না লেখেন কি যে।
সেদিন পড়ে শোনাচ্ছিলেন তোরে,
বুঝেছিলি?-বল মা সত্যি করে।
এমন লেখা তবে
বল দেখি কী হবে।

হয়নি বলেই মহিতচন্দ্র সেনকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'শিশুখণ্ডের কবিতা সবগুলি যে শিশুদের সম্বন্ধে তা নয়, কতকগুলি শিশুদের পাঠ্য'। তবে আমাদের ভাবনা রাখতে হবে এই কাব্যের আগেই রবীন্দ্রনাথ 'বাংলার লোকছড়ার বিপুল ঐশ্বর্যে গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছেন, লোকছড়া বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছেন এবং লোকছড়া সংগ্রহের আহ্বানও জানিয়েছেন।' [ছড়ায় বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি/ সৈয়দ মোহাম্মদ সাহেদ] সুতরাং এই গ্রন্থের কিছু কিছু পদ্যে লোকছড়া তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে ধরা পড়তে চেয়েছে। ধরা পড়তে চেয়েছে শব্দবন্ধে ও ছন্দে। যেমন-

দিনের আলো নিবে এল,
সুয্যি ডোবে- ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে। [বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর]

অথবা,

সাতটি চাঁপা সাতটি গাছে,
সাতটি চাঁপা ভাই
রাঙা-বসন পারুল দিদি
তুলনা তার নাই। [সাত ভাই চম্পা]

তবে নির্ভার এবং 'অর্থবন্ধনশূণ্যতা'ময় নিছক হয়ে উঠতে না পারার পিছনে মূল কারণ কবির মন। যে মন ভারাক্রান্ত ছিল সদ্য স্ত্রীর মৃত্যু জনিত সন্তাপে আর তারও আগে শিশুপুত্র শমীন্দ্রের অকাল প্রয়াণে। সে কারণেই, "লিখতে গেলেই খোকা এবং খোকার মার ভাবটুকুই সূর্যাস্তের পরবর্তী মেঘের মতো নানা রঙে রাঙিয়ে ওঠে- সেই অস্তমিত মাধুরীর সমস্ত কিরণ এবং বর্ণ আকর্ষণ করে আমার অশ্রুবাষ্প এই রকম খেলা খেলবে- তাকে নিবারণ করতে পারিনে।" [মোহিতচন্দ্র সেনকে লেখা পত্র, পত্রাবলী-২৫]। 'শিশু' প্রকাশের আঠার বছর পর, ১৯২২-এ প্রকাশিত হল 'শিশুভোলানাথ'। এর পদ্যগুলি লেখা হল মনের রিলিফের জন্য, "দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এতবড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকান্তরে বিস্তৃত। এইজন্য কল্পনায় সেই শিশু-লীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশু- লীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করার জন্যে।" [পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি] এই ভাষ্যে নির্ভার হবার কথা আছে, বন্ধনমুক্তির কথা আছে। আর একারণেই 'শিশুভোলানাথ' এর কবিতায় লেগেছে ছড়ার হালকা চাল। প্রায় সব কবিতাই ছড়ার আঙ্গিক নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কিছু উদ্ধার করা যেতে পারে-

এক যে ছিল চাঁদের কোণায়
চরকা কাটা বুড়ি
পুরানে তার বয়স লেখে
সাতশো হাজার কুড়ি। [বুড়ি]

অথবা

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা।
ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়েছিলাম ছুটে,
দেখতে ডালিম গাছে
বনের পিরতু কেমন নাচে। [রাজা ও রাণী]

অথবা সেই মনমাতানো ছড়াটি,

তালগাছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে
সবগাছ ছাড়িয়ে
উঁকি মারে আকাশে। [তালগাছ]

শেষবিচারে এই গ্রন্থের কোন রচনাকেই পূর্ণাঙ্গ ছড়া বলা যায় না, যতই এরা নির্ভার হালকা রসের হোক না কেন। রবীন্দ্রনাথের ছড়ায় পূর্ণতা লক্ষ্য করার জন্য আমাদের নজর দিতে হবে 'খাপছড়া'য়।

'খাপছড়া' প্রকাশিত হয় ১৯৩৬-এ, জীবনের শেষপ্রান্তে। এই গ্রন্থটিকেই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ এবং সার্থক ছড়াগ্রন্থ বলা যেতে পারে। জীবনের শুরু থেকে যে লোকছড়ার অমৃতসাগরে তিনি নিমজ্জিত হয়েছিলেন এবং বাংলা কবিতার পথ খুঁজেছিলেন সেই লোকছড়ার আদলেই রচনা করলেন 'খাপছড়া'। লোকছড়ার আদলেই রইল না এদের কোন শিরোনাম, আয়তন হল হ্রস্ব। বাংলায় মাটির গন্ধ নিয়ে ঝংকৃত হল ছন্দ। যেমন-

অল্পেতে খুশি হবে
দামোদর শেঠ কি।
মুড়কির মোয়া চাই,
চাই ভাজা ভেটকি।

অথবা,

মুচকি হাসে অতুল খুড়ো,
কানে কলম গোঁজা।
চোখ টিপে সে বললে হঠাৎ
'পড়তে হবে মোজা।'
হাসল ভজা, হাসল নবাই-
'ভারি মজা' ভাবল সবাই-
সবসুদ্ধ উঠল হেসে,
কারণ যায় না বোঝা।

'খাপছাড়া'য় লোকউপাদান কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার বিস্তৃত আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ 'ছড়াকার' বলে কোন উপাধী না পেলেও জীবনের শেষপ্রান্তে এসে একটি সার্থক ছড়াগ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন। তবে এটি বড় কথা নয়। তিনি যে গ্রামীণ সংস্কৃতির নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করেছিলেন এবং সে সবের মধ্যদিয়ে আত্মনির্মাণের রাস্তা খুঁজে ছিলেন এবং পেয়েছিলেন সেটিই বড় কথা। এই পাওয়ার মধ্যদিয়েই শুধু কবিতায় নয় সাহিত্যকে তার নিজ ঠিকানায় পৌঁছে দিয়ে আধুনিক করে তুলেছিলেন। আজ উত্তরাধুনিকতার ধুয়া তুলে অনেকেই বাহাবা নিতে চান কিন্তু তারা রবীন্দ্রনাথকে পাশ কাটিয়ে কিভাবে রাস্তা খোঁজেন তা বোধের বাইরেই থেকে যায়। রাস্তা খোঁজেন কি?

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

Be RICH
stock brokerage | wealth management

"আপনি কি জমাকৃত পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী?
আপনার সঞ্চয় নিজেই স্বাধীনভাবে বিনিয়োগ করুন।"

আমাদের সেবাসমূহ

* BO Account খোলা হয় ও শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
* আমরা Full Depository Participant (DP)।
* অনলাইনের মাধ্যমে বিও (BO) একাউন্ট খোলা যায় এবং মনিটরিং করা যায়।
* ইন্টারনেট এর মাধ্যমে যে কোন অবস্থানে বসে নিজেই নিজের শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করা যায়।
* প্রাইমারী শেয়ার (IPO) আবেদন এর ক্ষেত্রে ফরম পূরণ থেকে ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়া, allotment and refund সংগ্রহ করা এবং refund ব্যাংকে জমা দেওয়া পর্যন্ত আমরা নিজেরাই করে থাকি।
* আমরা Investor এর শেয়ার মনিটরিং ও Portfolio Service দিয়ে থাকি।

এক দিনে BO একাউন্ট খোলা যায়

যোগাযোগের ঠিকানা

Be Rich Limited
(Rangpur Investor Care)
চিত্রকলা ভবন, ২য় তলা, কাচারী বাজার, রংপুর। মোবাইল ঃ ০১৭৩০০৪২৫১

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় হোক সকল ঐতিহ্যের উদাহরণ!

নিখিল চন্দ্র বর্মন
সহকারি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, বেরোবি

২০০৮ সালের ১২ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা লাভ করে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে হিসেব করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স মাত্র তিন বছর। দেশের উত্তর জনপদে প্রতিষ্ঠিত এ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টি নবীনত্বের গন্ধ মুছতে না মুছতেই প্রবীণ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। মাত্র তিন বছরে পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নিয়ে নিজস্ব ক্যাম্পাসে স্থান করে নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। চলতি শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হবে তিন সহস্রাধিক। বিভাগের সংখ্যা পনের থেকে হবে বিশের অধিক। নিরিবিলি পরিবেশে দৃষ্টিনন্দন ভৌত অবকাঠামো আর শিক্ষার অনুকূল পরিবেশে ইতোমধ্যে সারাদেশের মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছে। দেশের জাতীয় পর্যায়ের জ্ঞানী-গুণিজনের উপস্থিতিতে এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছে নানা ধরনের শিক্ষা-গবেষণা সামাজিক সাংস্কৃতিক সেমিনার সিম্পোজিয়াম। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অঙ্গসংগঠনগুলোর নানাবিধ কর্মসূচি সতেজ করে রেখেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে। সন্ত্রাস ও সেশনজট মুক্ত পরিবেশে এগিয়ে যাচ্ছে এখানকার একাডেমিক কার্যক্রম। এর সবগুলোই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব করার মত প্রাথমিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য। গত ১৮ জুলাই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বর্তমান ইউ জি সি চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ এ কে আজাদ চৌধুরীকে দেয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নোয়খালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মন্তব্য করেছেন- "বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় নবীন নয়, প্রবীণ বিশ্ববিদ্যালয়।" বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক অবস্থা দেখেই তিনি বিমুগ্ধ হয়ে এ মন্তব্য করেছেন।

সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত যে কোন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এর সার্বিক কার্যক্রম প্রশংসার দাবিদার। নতুন নতুন ইতিহাস গড়তে সক্রিয় থাকা আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব। আমাদের দায়িত্ব হওয়া উচিত অর্জিত ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করা এবং নতুন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করা। প্রত্যেকের সৃজনশীল চিন্তা, শিক্ষা ও গবেষণা এ বিশ্ববিদ্যালয়কে অনাগত ভবিষ্যতে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে। সে লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সহমর্মিতা নিয়ে শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হলেও প্রতিদিনের খবরের পাতায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস, খুন, চাঁদাবাজি, দলাদলি, অন্তঃকলহ, যৌন ও নারী নির্যাতন ইত্যাদির মত কলঙ্কজনক সংবাদ দেখতে পাই। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন সে রকম কিছু না ঘটে সে ব্যাপারে সর্তক ও সচেতন থাকতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যের উদাহরণ দিয়ে যদি বলি তাহলে বলতে হয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের কথা। সারা বিশ্বে যখন আন্তর্জাতিক নারী অধিকার আন্দোলনের শতবর্ষ উদযাপনের প্রাক প্রস্তুতি চলছিল ঠিক সেই সময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এটি একটি বিরল ইতিহাস। মহিয়সী বেগম রোকেয়া যেমন ছিলেন বাঙালি নারী জাগরণের অগ্রদূত, তেমনি ছিলেন বিশ্ব নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক। সেই মহিয়সীর মত আরও অনেক নারী অধিকার আন্দোলনের নেত্রী আছেন। একমাত্র বেগম রোকেয়া ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন নারী নেত্রীর প্রতি এমন বিরল সম্মান কেউ দেখায়নি। এটি আমাদের ইতিহাস, এটি আমাদের ঐতিহ্য; এটি বাঙালি জাতির গর্বের বিষয়। আর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্য হিসেবে আমরাও গর্বিত হব এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই গর্ববোধের পাশাপাশি আমাদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হবে। আমাদেরকে

রোকেয়া আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এখানে থাকবে না কোন যৌন হয়রানী, নারী নির্যাতন, থাকবে না কোন লিঙ্গ বৈষম্য। থাকবে না অত্যাধুনিকতার নামে অপসংস্কৃতি। বরং বেগম রোকেয়ার আদর্শ এমন হওয়া উচিৎ যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলে রোকেয়া আদর্শের প্রতি সচেতন থাকবে এবং অন্যকে সচেতন করে সমাজ ও জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সক্রিয় থাকবে। রোকেয়ার আদর্শে সকলকে শিক্ষাণুরাগী হতে হবে, স্বেচ্ছাসেবী হতে হবে, নারীর অধিকার দিতে উদারচেতা হতে হবে এবং নারীর প্রতি সমমর্যাদা দিতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব গড়তে সহযোগিতা করতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও বাইরে নৈতিক ও সামাজিক আদর্শে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে হবে। তবেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার আন্দোলনের স্বার্থকতা প্রস্ফুটিত হোক এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে আমাদেরকেই দায়িত্বশীল অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

আর একটি বিষয়, সন্ত্রাস ও সেশনজট বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের সস্তা কলঙ্ক। কিন্তু বিগত তিন বছরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সে কলঙ্কমুক্ত আছে নিশ্চয়। এ ঐতিহ্য ধরে রাখতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রশাসন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলকে সচেতন থাকতে হবে যেন সন্ত্রাস আর সেশনজটের কলঙ্কের ছাপ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়ে। সেশনজটমুক্ত রাখতে শিক্ষার গুণগত মান বজায় রেখে যথাসময়ে বিভাগীয় ও একাডেমিক কার্যক্রম সমাপ্ত হওয়া উচিত। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা, ফলাফল ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে হবে। সামান্য আলস্যই এ কলঙ্কের জন্য যথেষ্ট। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষার প্রতিযোগিতা এবং সেমিস্টার সিস্টেম পাঠ্যসূচির ব্যস্ততার মাঝে শিক্ষার্থীদের মনোনিবেশ থাকলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাস কিংবা অপসংস্কৃতিমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার সুযোগ নেই। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একাডেমিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থেকে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করবে। অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী শ্রেণীকক্ষের ভিতরে ও বাইরে পাঠদানের মাধ্যমে এবং নিজেদের সৃজনশীল শিক্ষা ও গবেষণায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি নিজ নিজ অবদান রাখবে আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আন্তরিকতা ও দক্ষতার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, এটাই হোক সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ।

new
computer museum
sales, service, software solution...
01713 272 038, 0521-65213
computermuseum2u@gmail.com
1st floor, rojonigandha hotel, jahaj co. more, rangpur-5400

শিশু ও শিশুশ্রম

সাদিয়া আরেফিন ঝিনুক, শিক্ষার্থী, মার্কেটিং বিভাগ, বেরোবি

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তার ছাড়পত্র কবিতায় বলেছেন,

"এ পৃথিবীকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি,
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

এ অঙ্গীকারটি শুধুমাত্র সুকান্ত ভট্টাচার্যই করেননি সারা বাংলার মানুষ করেছিলেন। কারণ এ কবিতাটির জন্য কবি পেয়েছিলেন অসংখ্য প্রশংসা। এখনও স্কুল-কলেজে কবিতাটির সুমিষ্ট আবৃত্তি শুনতে পাই। কিন্তু এর তাৎপর্য শুধু কবির কবিতাতেই সীমাবদ্ধ। বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন খুবই নগণ্য।

বাংলাদেশের প্রায় ৭৬ লাখ শিশু নিজের ও পরিবারের অন্ন জোগাতে অল্প বয়সেই শ্রমিকের জীবন বেছে নিচ্ছে। এ জন্য আমরা প্রধানত দরিদ্রতাকেই দায়ি করতে পারি। এছাড়া রয়েছে সম্পদের স্বল্পতা, অসম বণ্টন, ন্যায় বিচার ও সুশাসনের অভাব ইত্যাদি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর দ্বিতীয় জাতীয় শিশু শ্রমিক সমীক্ষা অনুসারে ছেলে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৭৩.৫ শতাংশ এবং মেয়ে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২৬.৫ শতাংশ। এ সকল শিশু শ্রমিকের মধ্যে ১৩ লাখ শিশু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো হল: বিভিন্ন ফ্যাক্টরির কাজ, লবণ কারখানা, পরিবহন ক্ষেত্র, ট্যানারী খনি সংক্রান্ত কাজ, ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ, পাথর ভাঙা, গ্লাস ও কাঁচ তৈরির কারখানা, চোরাচালান, মাদক ও অস্ত্র বহন, যৌনকর্ম ও আরো অনেক কাজ। এতে প্রতি বছর অসংখ্য শিশুর অঙ্গহানী ঘটছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। এই সব শিশুর শতকরা ১০ ভাগের বয়স ১২ বছরের নীচে। অথচ জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ অনুসারে শিশু বলতে ১৮ বছরের কম বয়সী বাংলাদেশের সকল মানুষকে বোঝায়। Bangladesh Institute of Labour Stadies অনুযায়ী ৩৭% শিশু গৃহকাজে নিযুক্ত। ৫-১৪ বছর বয়সের শিশু গৃহকর্মীদের ১৭ শতাংশই যৌন নির্যাতনের শিকার। বিশেষ করে যে সব শিশু কুলি-মজুরের কাজ করে তাদের মাঝে অপরাধ করার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। বিভিন্ন ধরনের অপরাধের শিকার হয়ে এসব শিশু দেশের প্রতি প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে ওঠে।

বর্তমান উন্নত ও সচেতন বিশ্বের একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে আমরা কখনই একটি শিশুর নিষ্পাপ ও আলোকিত মুখ দেখার পরিবর্তে আসহায়, নির্জীব, শোষিত ও রুদ্ধ শিশু দেখতে চাইনা। একটি শিশু নতুন কুঁড়ির মতো যা আগামী দিনে ফুল হয়ে ফোঁটার অপোয় রয়েছে। যারা দেশকে পৌছে দেবে সম্ভাবনার স্বপ্নের দ্বারে। এই সকল শিশুর অধিকারের প্রতি থাকতে হবে আমাদের অপার শ্রদ্ধাবোধ। তাদের সোনালি সুদিন এবং নিশ্চিত ভবিষ্যত উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিশু অধিকার আইন, যেমন- শিশু নিয়োগ আইন ১৯৩২, কারখানা আইন ১৯৬৫, শিশুশ্রম আইন ১৯৮৫, শিশু আইন ১৯৭৪ ও বিভিন্ন শিশু নীতিমালার বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে এবং শিশু শ্রম প্রতিরোধে সব ধরনের শিশুশ্রম নিরসন করা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম বন্ধ করা, পথ শিশু ও ছিন্নমূল শিশুদের পুনর্বাসন করা প্রয়োজন। এজন্য বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও দেশের সকল মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যেতে হবে। যাতে আমরা কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের নবজাতকের কাছে দেয়া অঙ্গীকার পূরণ করতে পারি এবং দেশ ও বিশ্বকে শিশুদের বাসযোগ্য করতে সক্ষম হই।

শিশুর চোখে

বঙ্গবন্ধুর শৈশব

প্রজ্ঞা সিদ্দীক, শিক্ষার্থী, ৭ম শ্রেণী,পটুয়াখালী সরকারি বালিকা বিদ্যালয়

১৭ মার্চ ১৯২০ সাল। বাংলা ১৩২৭ সানের ২০ চৈত্র। মঙ্গলবার রাত ৮টা। টুঙ্গিপাড়া তখন একটি গাঢ় অন্ধকারের চাদরে ঢাকা গ্রাম। এই অন্ধকার রাত্রে আলোর দিশারী স্বাধীন বাংলার পথ প্রদর্শক শেখ মুজিবুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম লুৎফর রহমান এবং মাতার নাম সাহেরা খাতুন। ৪ বোন ও ৬ ভাইয়ের মধ্যে তিনি তৃতীয়। তাঁর ডাক নাম ছিল 'খোকা'। তখন কে জানত তাদের এই সেই ছোট্ট খোকাই একদিন এই বাংলার বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠবে। তাঁর জন্ম ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহাকুমার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। গোপালগঞ্জ তখনও জেলায় পরিণত হয়নি আর টুঙ্গিপাড়া তখন একটি অখ্যাত গ্রাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রথমে সীমাডাঙ্গা-টুঙ্গিপাড়া প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করানো হয়। এরপর তাকে মাদারিপুরের ইসলামিয়া হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়। ১৯৪২ সালে তিনি গোপালগঞ্জ মিশন হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই তিনি ১৯৬৭ সালে মেট্রিক পাস করেন। শৈশবকালেই আমার তার সাংগঠনিক প্রতিভার বিকাশ দেখতে পাই। ছেলেবেলাতেই তিনি 'মুসলিম সেবক সমিতি' নামে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। দয়ালু হিসেবে শৈশবকাল থেকেই তাঁর খ্যাতি ছিল। মানুষের দুঃখ কষ্ট তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। একদিন তিনি একজন বৃদ্ধ মানুষকে শীতে কষ্ট পেতে দেখে তাঁর গায়ের চাদর দিয়ে দেন। নিজে বৃষ্টিতে ভিজেও তাঁর ছাতা এক সহপাঠী বন্ধুকে দিয়ে দেন। প্রতিবাদী চেতনা তাঁর আরেকটি বড় গুণ। একদিন তিনি একটি অসুস্থ পাখি বন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে তার সেবা যত্ন করে সুস্থ করে তুললেন। হঠাৎ একটি বিড়াল এসে পাখিটাকে নিয়ে যায়। তখন তিনি রাগে দুঃখে বিড়ালটাকে মারতে একটি লাঠি নিয়ে তাকে মারার জন্য তাড়া করেন। সুতরাং বোঝাই যায় প্রতিবাদী চেতনা তার শৈশবকালেই প্রকাশ পেতে থাকে। বঙ্গবন্ধু সত্য কথা বলতে কখনই কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এক দিন শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জের এক স্কুল পরিদর্শনে এলেন। বঙ্গবন্ধু তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। সবাই মিলে ঠিক করল স্কুলের সমস্যা নিয়ে এ কে ফজলুল হকের সাথে কথা বলবেন। কিন্তু ভয়ে কেউই কিছু বলতে পারছেন না। তখন বঙ্গবন্ধু এগিয়ে এলেন এবং শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হক-কে সমস্ত সমস্যার কথা বললেন। এতে করে আমরা তার নেতৃত্ববাদী ও সত্য বলার সাহস লক্ষ্য করি। আর এ ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের মানুষ। তাঁর ছিল সত্য বলার সৎ সাহস এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আজকে যারা শিশু তারা আগামী দিনে আমাদের দেশ গড়ার জন্য বৃহৎ ভূমিকা পালন করবে। তারা গড়ে তুলবে শক্তিশালী নেতৃত্ব, দেশ। তাই বঙ্গবন্ধুর শৈশবকাল আমাদের বাঙালি জাতির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই তাঁর জীবনের এই ছোট ছোট ঘটনাগুলো আগামী দিনের শিশুদের উজ্জীবিত করবে। আর এ থেকেই গড়ে উঠবে আমাদের দেশ, আমাদের সকলের স্বপ্নের সোনার বাংলা।

নারী ও নারীর প্রতি অপদৃষ্টি

মোঃ তৌহিদ নূর শাফি, শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, বেরোবি

"সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তার "নারী" কবিতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারীর জয়গান গেয়েছেন। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, ইংরেজি সাহিত্যেও নারী স্থান পেয়েছে অনেক যুগ আগেই। নারীকে নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ। নারীর অধিকারের কথা, অসহায়ত্বের কথাও বলা হয়েছে বারবার। তবু কি নারী তার যোগ্য স্থান, সম্মান, অধিকার পেয়েছে?

আমাদের সমাজে এখনও নারী অসহায়, ভোগ্যপণ্য অথবা যৌনসামগ্রী হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আসছে। বর্তমানে নারীরা স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষিত হচ্ছে কী? নারীরা আজও পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহক। আমাদের দেশে এখনো অনেক নারীই জানে না, তারা নির্যাতিত, অবহেলিত। বেশির ভাগ নারীই ভয় পায় পুরুষদের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেতে, নিজের ইচ্ছামত বাঁচতে। নারীর এই অসহায় অবস্থাটি সৃষ্টি করেছে পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বলতে গেলে, সেই প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত পুরুষরা চেয়েছে নারীকে শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে। শৃঙ্খলিত অবস্থায় থাকতে থাকতে আজ তারা জড় পদার্থের মত নীরবেই সবকিছু মাথা পেতে নিয়েছে। তবে একথা সত্য, নারীর এই অবস্থার জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারী নিজেও সামান্য হলেও দায়ী। স্বাধীনতা, মুক্তি কেউ সহজে অর্জন করতে পারে না, যতক্ষণ না সে চেষ্টা করে নিজের মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। বেগম রোকেয়া নারীর সেই মুক্তির পথ খুঁজে নিতে খুব সহজভাবেই, কিন্তু তার দীপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন- জাগো গো ভগিনী। তাহলে নারীরা কেন নিজেদের অধিকার, মুক্তি নিজেরা খুঁজে নিতে পারে না।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরা মেনে নিতে পারে না নারীরা মানসিকভাবে সবল, নৈতিকভাবে স্বাধীন মানুষ ও অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর। আসলে তারা ইচ্ছা করেই তা মানতে চায় না। কারণ পুরুষেরা নারীর ক্ষমতায়নকে পছন্দ করে না। তারা নারীকে হাতের মুঠোয় করে রাখতে চায়। পদদলিত করতে চায়। তাদের ইচ্ছামত না চললে নারী ভালো নয়, নারী স্বেচ্ছাচারী। নারীরা এই স্বাধীন দেশে এখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না, বাঁচতে পারে না তাদের ইচ্ছামত। নারীদের নাকি কোন ইচ্ছা থাকতে নেই, পুরুষরা যেভাবে চাইবে নারীরা তাদেরকে ঠিক সেইভাবে তুলে ধরবে। নারী বেঁচে থাকবে পুরুষের জন্য, নিজের জন্য নয়। ছোটবেলা থেকেই তাদের বলা হয়, গাছে না উঠতে, ঘর থেকে বাহিরে না যেতে, মাটিতে আস্তে হাঁটতে, ছাদে না উঠতে, ছেলেদের সাথে না মিশতে, প্রেম না করতে, বিয়ের পর স্বামীর সবকথা শুনতে। নারীর কোন মতামত থাকবে না, থাকবে না কোন অংহকার। এটাই নাকি নিয়ম। এক্ষেত্রে আমার ভোটাধিকার আন্দোলনের নেত্রী এলিজাবেথ ক্যাডি স্ট্যানটনের কথা মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন- 'We are, as a sex, infinitely superior to man.' যদিও আমার সন্দেহ হয়, এই স্বাধীন দেশে ক'জন নারী একথা বিশ্বাস করে।

পথে-ঘাটে, ঘরে-বাইরে সর্বত্র নারীরা আজ যৌন হেনেস্তার শিকার। যৌন হেনেস্তাকে এখন 'ইভটিজিং' বলা হয়ে থাকে। আমার মতে, `sexual harassment' বা যৌন হেনেস্তার মতো ভয়াবহ, নোংরা, ভয়ানক কুৎসিত জিনিসকে 'ইভটিজিং' আখ্যা দিয়ে একে রোমান্টিসাইজ করার অর্থ এই নয় কি, যে এর ভয়াবহতাকে কমিয়ে ফেলা। রোমান্টিক জুটি আদম-ইভ এর ইভকে তুলে এনে তার সাথে টিজ বা

খুনসুটি করাকে খুব রোমান্টিকভাবেই দেখা হচ্ছে না কী? আমাদের দেশে মেয়েরা শিশু থাকতেই কোন না কোনভাবে যৌন হেনেস্তার শিকার হয়। প্রায় ৮৩ শতাংশ ক্ষেত্রে ওই যৌন হেনেস্তা করছেন পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজনেরা। ৪৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিটি শিশুটির পরিচিত কেউ না কেউ। সচরাচর এসব ঘটনা পরিবারেই ধামাচাপা দেওয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শিশুরা অসহায়ত্বকে নীরবে মেনে নিয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। যৌন হেনেস্তার কারণে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে কত নারী আত্মহত্যার মতো জঘন্য পথ বেছে নিচ্ছে তা আমাদের কারো অজানা নয়।

আমাদের দেশে নারী নির্যাতন বন্ধে বর্তমানে অনেক আইন প্রচলিত আছে। তবে ভেবে দেখার বিষয়, কতজন নির্যাতনকারী শাস্তি পায়, কতজন নারী তার যোগ্য বিচার পায়, আর কতজন নারী এই সমাজে সত্যিকার নিরাপত্তা পায়। আমাদের দেশে সমাজ ব্যবস্থা এমন পর্যায়ে চলে এসেছে যে, সঙ্গত কারণে আমার বলতে ইচ্ছা করছে- রোগের চিকিৎসা না করে রোগের উপসর্গের চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে আমার জানতে ইচ্ছা করছে-এতে রোগ সারবে কী, সারলেও কতটুকু?

আমি বুঝতে পারি না নারীকে এখনো কেন আমরা নারী হিসেবে না ভেবে মানুষ হিসেবে ভাবি না। আমার মতে, নারীকে মানুষ হিসেবে নারী এবং পুরুষ উভয়ই শ্রদ্ধা করতে, ভালোবাসতে শিখলে, নারীর বিরুদ্ধে কোন কর্মকাণ্ড ও কুসংস্কার আর সমাজে থাকবে না। আলাদা করে নারীর জন্য কোন আইনও প্রণয়ন করতে হবে না। তাহলেই যৌন হেনেস্তার কারণে আর কোন নারীকে এই পৃথিবী থেকে চিরতরে চলে যেতে হবে না। এ পৃথিবী হবে মানুষের, যেখানে মানুষকে নারী অথবা পুরুষ হিসেবে পৃথক করা হবে না।

Kenjiss
Impression Wears
Kenjiss
Impression Wears
Shop No - 105,6,7, Jahaz Company
Shopping Complex, Rangpur
Phone : 01717413918

সরিফা সালোয়া ডিনা
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, বেরোবি

সময়

সময়ের এক ফোঁড় না হয় হলোই অসময়ের দশ ফোঁড়ের সমান
না হয় সম্পন্ন হলোই আঠারো মাসে কাঁথার বুনন, অথবা
আধিদৈবিক সময় প্রস্রবণের মতো গেলো বয়ে–তাতে কি বা
আসে কার। সময়ের বাতাবরণ নিয়ে তাই ভাবনা
নেই খুব বেশি। যাক বয়ে সময় নদী ও স্রোতের মতোন।

এই ঘোরতর অমানিশা তাই আঁধার নয়, পরিযায়ী
পাখির দূরদর্শী দৃষ্টি যেমন; অগ্রবর্তী হলেই ক্রমশ
সুস্থতা। এইসব সুস্থতা জমাট বাঁধে, কখনোবা স্বপ্ননীড়ে থাকে বিভোর–
নক্ষত্রপুঞ্জের ম্লান আলো যেভাবে ক্ষণিক আলোর তরঙ্গে বাঁধে বাসা।

তবুও ভুলি কি করে সময়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অশেষ
এফোঁড় ওফোঁড় করে গেঁথে তোলে সমস্ত শিকার
আমাদের আটপৌঢ়ে জীবনে আসে কালকেতু
ব্যাধের ক্ষিপ্র শিকারে সময়ানুবর্তী; তবু সঞ্চয় যত
সকলি ফেলে যাই, দূরবর্তী নিশানার কাছে ক্রমাগত।

মোঃ ফেরদৌস রহমান
বিভাগীয় প্রধান, মার্কেটিং বিভাগ, বেরোবি

এ কেমন আশা তুলনাহীন

তোমার আঁকা ছবিতে আমি মুগ্ধ হয়েছি
তোমার ঐ ঠোঁটের হাসিতে আমি ভালবাসতে শিখেছি,
এ কেমন আশা তুলনাহীন;
আমি যে তোমাকে পেতে চাই চিরদিন।
শুধু জয়ের মালা তুমি পরেছো
আমাকে প্রেমের জ্বালা তুমি দিয়েছো
আমার একক আশা একক রয়ে যাবে চিরদিন
তবুও আপন করে পেতে চাই একদিন।
এ কেমন আশা তুলনাহীন
আমি যে তোমাকে পেতে চাই চিরদিন।

রিষিণ পরিমল
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেরোবি

বৃষ্টি

আহা, ভিজে যাচ্ছে পরাণ
পালক ও পাখির তুলতুলে বুক
ধুন্দল বকফুল বকুলের ঘ্রাণ
ভিজে যাচ্ছে লাজুক অধর চিবুক

বৃষ্টি ঝরে ঝরুক আবার
পলকে পলকে পাখায় পাখায়
কালি-আঁকা মেঘ ঘূর্ণিচাকায়
শাখা ও শেকড়ে উল্লাসে মাতুক, আর
অপার জলে ভিজুক
বাংলার মাটিরঙ রমণীর অমল ঔৎসুক

বৃষ্টি আসে আসুক
চর্যার গানগুলি বৈষ্ণব পদাবলি
শবরশবরী কাহ্ন-ভুসুক
জলের সন্ধ্যায় জ্বালুক দীপাবলি

ও জলছাট
ভেজাও ভেরেণ্ডা ভাট
নগর বাহিরের গুঞ্জরী ফুল
ভেজাও বমাল
কদম তমাল
রাধা ও রাধিকার মান-রাঙা ভুল

বৃষ্টি নেমে আসুক তুমুল
জলধারে ভিজে যাক মেঘরঙ চুল
ভেজাচুলে ছলোচ্ছলে ওহে মেঘবালা
ভেজাও আমারে সখা অতুল উৎরোলে
জল-চঞ্চলে
পশ্চাতে পড়ে থাক জড় পান্থশালা

সাজিয়া আফরিন
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, বেরোবি

অন্তরালে

যবনিকার আড়াল হতে
নির্লিপ্ত নিদ্রি অন্ধকার
ডাক দিল দূরপাল্লার পথে
সীমানা পারাবার।

দ্বিধাসংকুল চিত্ত তবে
সাহসিল দ্রুত তানে
আলোকের বিরহলয়ে
আঁধারের মুক্তির পানে।

সহসা চমকিয়া উঠি
দেখিল যোগী এক
অসীম অন্ধকার ঘিরি
রচিছে নব আলোক।

ঘুচিল দ্বিধা সংশয়
লভিয়া দীপ্তি তার
নব বজ্রসম সত্য
খুলিল রুদ্ধ দ্বার।

মোঃ আতিউর রহমান
প্রভাষক, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, বেরোবি

ষড়-ঋতুর দেশ

গ্রীষ্মে গরম বেশতো
কণ্ঠ পিপাসায় শুষ্ক।
বর্ষায় প্রকৃতি সিক্ত
নদী-নালা পানিতে ডুবন্ত।

শরতে আকাশ মেঘমুক্ত
কাঁশফুলে চারিদিক শুভ্র।
হেমন্তে ক্ষেতে ধানের গন্ধ
ঘরে-ঘরে উৎসব নবান্ন।

শীতকালে পাতা ঝরে দিব্যি
রোদ পোহাতে লাগে বড় তৃপ্তি।
বসন্তে বাতাসে কদমের সুগন্ধ
কুহু ডাকে কোকিলের কণ্ঠ।

মাটি মুহাম্মদ
শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, বেরোবি

সাক্ষী শুধু রোদ্দুর

যে কথা কখনো মুখে বলিনি আগে
শতবার বলেছি সেকথা অনুরাগে
তুমি হাত বাড়ালে বন্ধু হবে বলে
তোমার হাতটি ধরে বুঝেছি সে বারে
ভালবাসা হারিয়ে গেলে বন্ধু হবার ছলে
তোমার কম্পিত ঠোঁট ছল ছল আঁখি
বুঝি বুঝি করেও বুঝিতে পারিনি
কি ভাষা লিখেছ, কি ছবি এঁকেছ
হৃদয় নিভৃতে
হঠাৎ তুমি কি যেন বলতে চেয়ে
থেমে গেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে
তোমার না বলা ভাষা কেড়ে নিল শত আশা
তুমি বললে আসি
তোমার পায়ের ছন্দ আমার হৃদয়ে দ্বন্দ্ব
আর কিছু নিস্তব্ধতা।

কায়সার আলম
শিক্ষার্থী, মার্কেটিং বিভাগ, বেরোবি

যদি ফিরে আসি

যদি ফিরে আসি–
দিনের আকাশে থাকে মেঘ;
কোন এক ঘরণীর আঁচলায় পেতে রাখা বিছানায়,
জীবন যখন আমার শরীরে সাদা আর কালোর সংমিশ্রণ।
শতাব্দীর মাঝামাঝি বয়সে,
ফিরে আসি–
কাঁঠালের ছায়ে ডাকা ঘুমন্ত মধ্যাহ্নে;
কোন একদিন...
শিশিরের জল তখনও তোমার পায়ের ছাপে ভেজা।
রাত্রি অথবা দিনে–
তোমার দুয়ারে দাঁড়াই এসে;
যাবার আগের ভোরে একদিন
অথবা
যেখানে শুকনো পাতারা পড়িতেছে ঝরে।
পায়ের শব্দে ভাঙে–
তুমি এসে দাঁড়াবে কি দুয়ারে?
একবার মুছে যাওয়া স্মৃতি, একবার পৃথিবীর পানে–
আরেকবার আকাশের পানে চেয়ে বলবে কি?
–কবি তুমি এতদিন পর এলে?
নিরুত্তোর কবি,
উঠোনের কাঁচা রোদ,
দেহ দিয়ে চুয়ে চুয়ে পড়ে শিশিরের নীল জল।
–তোমার সন্তান-সন্তানাদি–তুমি কি একা?
–দিয়েছি নিভায়ে ঘুম,
কত দিন রাত্রি একাকী!
শরীরে তার ধুলো আর মাটি!
–আর একবার কি ভালোবাসা দেবে!
টানা টানা কালো চোখ–
চোখের দু'পাশে আলতো আবেগ,
তবুও কপালে অনেক বিস্ময় রেখে বলবে নাতো?
–কবি তুমি একটুকুও বদলালে না!
চামড়ার ভাঁজ সময়ের বয়সে বাড়ে,
কবির নজরে তবুও তোমার নাশপাতি রঙের নাভী–
নাভীর নিচে গুজে রাখা সেই পাঁচটি ভাঁজের শাড়ি।
তখনও তোমার ঠোঁটের উপরে ঠোঁট,
হাতের উপরে হাত,
বুকের উপরে বুক,
দেহের ভিতরে দেহ...
তখনও তুমি চিকন ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি দিয়ে
আগের মতো বলবে নাতো?
–কবি তুমি এত খরাপ!
আমারে কি স্মরিবে না?
যদি ফিরে আসি–
সরিষার ক্ষেত বেয়ে
নিমতলীর হাঁটা পথে শান্ত কলোরলে একদিন।

সাদিয়া কাওছার
শিক্ষার্থী, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, বেরোবি

দৃষ্টিভ্রম

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, দুটি তারার মাঝে
তারাগুলো জ্বলছে আর নিভছে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, চাঁদের আড়ালে
কত শত মেঘের ডানা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, রাতের অন্ধকারে
জোনাকিরা সেখানে গান করে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, সন্ধ্যের গোধূলির দিকে
রাঙা সূর্যের আভা ছড়িয়ে যায় চারিদিকে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, ভোরের উষার আলোতে
প্রকৃতির ঘুম ভাঙে সহস্র রঙে রাঙিয়ে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, দিগন্তের দিকে
দৃষ্টি সেখানে অসমাপ্ত হয়ে ফিরে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, শূন্যতার দিকে
পূর্ণতা যেখানে হাতছানি দিয়ে ডাকে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, আকাশের নিলীমার দিকে
নীল উদারতা যেখানে ছড়িয়ে থাকে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, সাদা মেঘের দিকে
জমাট বাধা বরফে ছেয়ে গেছে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, অজানাতে কৌতুহলী হয়ে
জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, নিয়তির দিকে
রূঢ় বাস্তবতার নিরিক্ষে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, মায়ের চোখে
স্বপ্ন পুরণের হতাশায় চমকে উঠে
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি তোমার চোখে
হাতছানি দিয়ে ডাকছ তুমি আড়াল থেকে বিস্মিত
জীবনের মানে খুঁজে পেতে।

মোঃ শরিফুল ইসলাম
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেরোবি

পল্লীর স্মৃতি

মুক্ত বিহঙ্গের মত উড়ে চলে আকাশের পানে
শহরের গলিপথ ছেড়ে গ্রামের মেঠোপথ কাছে টানে
গ্রামের সবুজ ধানতে সমীরের হিন্দোল তোলে
মিষ্টি স্বরে ভোরের দোয়েল মনের কথা বলে
জোড়া গাছের নিচে রাখাল বালকের বাঁশির সুর
বাতাসের সাথে ভেসে চলে দূর থেকে বহু দূর
সুরের আবেগের সাথে কল্পনা বুনে চলে বাঙালি বধূ
সাদা কাশের সাথে প্রাণ খুলে হাসতে চায় শুধু।

সুমন কুমার রায় (এস কে রায়)
শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, বেরোবি

অতঃপর যখন জ্ঞানোদয় হয়

অতঃপর যখন জ্ঞানোদয় হয়
দিনমনির সোনালি আভার ঝলকানিতে
দূরে সরে সকল অন্ধকার, অজ্ঞানতা
প্রকৃতির অপরূপ রূপ ছটায়
শান্তির পরশে প্রশমিত ত্রি-ভূবন
জ্যোতিহীন বাঘ ফিরে পায় জ্যোতি
খেয়ে ছয় ছাগল; ধ্বংসে আগাছা
মনুর অন্তর্দৃষ্টি খুলে ফিরে আপন নিগুঢ়তা
আন্ত মন জ্যান্ত মারে সব অশরীরি প্রেতাত্মা
গঙ্গা জলে পঙ্কিল ধুয়ে শুদ্ধ শরীরে
শরীর এলিয়ে স্বচ্ছ সরোবরে
অনুভব সুখ যেন স্বর্গীয় সুখ।

সম্পূর্ন জাপানী প্রযুক্তিতে তৈরী
TYCOON Electronics
সর্বপ্রথম বাজারে নিয়ে এল Micro Processor যুক্ত প্রোগ্রামিং বেইস্
Digital IPS ও Digital UPS
সুবিধা সমূহঃ
- সম্পূর্ন অটোমেটিক।
- LCD মনিটরের মাধ্যমে সার্বক্ষনিক বৈদ্যুতিক মেইন ভোল্টেজ, চার্জিং পজিশন, ব্যাটারি লেবেল প্রদর্শন করে।
- Smart চার্জিং কন্ট্রোল ইউনিট ব্যাটারি কে দীর্ঘমেয়াদী করে।
- Stabilizer সিস্টেম ব্যাটারি কে লো-ভোল্টেজে ফুল চার্জ করতে পারে।
- নিজস্ব লাইনম্যান দ্বারা ফ্রি Installation এর ব্যবস্থা।
- দ্রুত সার্ভিসিং সেবার নিশ্চয়তা।

নগদ ও সহজ কিস্তিতে বিক্রয় করা হয়
২ বৎসরের ওয়ারেন্টি
চাঁদিমা কমপ্লেক্স - ২য় তলা (মালদহ্ হোটেলের বিপরীতে)
স্টেশন রোড, রংপুর।
মোবাইলঃ ০১৭১৭৪৪২২৫০, ০১৭১৭০১৮৫২৫

Electra

Existence

He is always with me.
Sometimes I can feel him.
Sometimes I can feel nothing
But he is always with me.
When I look at my past
I can feel he leaves me just
When I wondering my present
He exists in my heart.
I need not think myself alone.
I need not think my love has gone.
We vowed, we never leave one another
We vowed, we will always stay together
I can't believe he left my world
I can't believe the here after another world
I wanna believe he is alive
I wanna believe he is always mine.

Pran Krishna Sarker
National Teacher

Be kind to me

With best compliments
Wish to say, dear sir,
I the most senior teacher
Today, than the others.

Forty springs of my life
Have gone to teach,
And well done my duties
But never delay or miss.

Sir, I have no next chance
To attend competition,
But my junior brothers
Who are in opposition ?

They may participate again,
And may be champion
So I cordially request them
To create best situation.

Learned chairman and members
In the broad for selection,
To be kind and consider me
Draw your kind attention.

01715-949952
01714-230343
Earth Computers Ltd.
1 stop IT Solution
1st Floor, Nur Super Market
Zahaj Company More
Rangpur. Phone: 0521-61398

ক্যাম্পাস রঙ্গ

মোঃ মোরশেদ হোসেন
ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

এক

রাত ১১ টা। মোবাইলে একটা কল এলো, রিসিভ করলাম।
- আস্সালামালেকুম স্যার। উমর ফরুক বলছি। স্যার কি এখন ব্যস্ত?
- মোটামুটি- কি বলবে।
- স্যার, আপনার লেখাটা।
- লেখা, সময় পাচ্ছিনা, থিম পাচ্ছিনা।
- না স্যার, আপনাকে লিখতেই হবে। আপনার লেখা পাবলিক খুব খায়।

আমি মনে মনে আত্মগৌরব অনুভব করলাম। আমার লেখা পাবলিক খুব খায়। তাই লিখতেই হবে। কাগজ কলম নিয়ে বসি। কলমের পিছনের অংশ দাঁতের কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত হয়। কিছু একটা লেখার চেষ্টা। হঠাৎ মনে পড়ে গেল গত গুনগুন সংখ্যায় ইংরেজির শিক্ষক জিনাত শারমিনের লেখা একটা লাইন। জিনাত লিখেছে গুনগুন সম্পাদক বলেছে তার লেখা পাবলিক খুব খায়। খোঁজ নিয়ে দেখলাম, শুধু জিনাত নয়, নাজমুল হক, শিমুল মাহমুদ সবাইকে একই কথা বলে গুনগুন সম্পাদক লেখা আদায় করে। আর আমরা ওর কথায় খুশি হয়ে... ।
- পাতলা লিকেলিকে ছোট্ট মানুষ, গুনগুন সম্পাদক, হাতের কাছে পেলে ... ।

দুই

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. তাজুল ইসলাম - এর চেম্বারে কি কারণে যেন গিয়েছিলাম। হঠাৎ উনি বললেন, মোরশেদ ভাই আপনি চাকরির পাশাপাশি পার্ট-টাইম কিছু করছেন নাকি। আমি অবাক হয়ে বললাম, কি রকম পার্ট-টাইম? উনি বললেন, এই কালের কণ্ঠের এজেন্সী-টেজেন্সী। আমি বললাম নাতো। হঠাৎ এটা মনে হলো, কেন আপনার? উনি বললেন, না, কদিন দেখলাম অনেককে কালের কণ্ঠ পত্রিকা কিনতে বলেছেন, তাই। তখন মনে হলো, কালের কণ্ঠ তখন সদ্য বাজারে এসেছে। ১০ টাকায় ৭০-৮০ পৃষ্ঠা, অনেক ভাল লেখাসহ। ২/১ জনকে কিনে দিয়েছি। কাউকে কিনতে বলেছি। এতেই উনি মনে করেছেন আমি কালের কণ্ঠ পত্রিকার এজেন্সি নিয়েছি। আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না।

তিন

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ড. তাজুল ইসলাম একদিন আমার ডিপার্টমেন্টে এসে বসলেন। মেজাজ তিরিক্ষি তার, কি এক বিষয়ে নিয়ে। আমি বললাম তাজুল সাহেব কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমরা শিক্ষক আর আমাদের প্রমোশন দিবে ইঞ্জিনিয়াররা, এটা কোনদিন হয়। শুনে তো আমাদেরও মাথা ঘুরে গেল। বলেন কি? কোথায় পেলেন একথা। উনি বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে এটা লেখা আছে। আমি বললাম আইন তো আমরাও পড়েছি। কিন্তু কোথাও তো একথা পাইনি। উনি বললেন "কেন লেখা আছে না, প্ল্যানিং কমিটি শিক্ষকদের পদোন্নতির সুপারিশ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যানিং কমিটি তো ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে তৈরী"। শুনে সবাই থ। তাকে বুঝানো হলো এ প্ল্যানিং কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যানিং কমিটি নয়। এটা বিভাগের প্ল্যানিং কমিটি, যেখানে বিভাগের শিক্ষকরা থাকবেন। শুনে উনি আশ্বস্ত হলেন।

[টমাস আলভা এডিসন নাকি নিউটন তার দুটো পোষা কুকুরের বাসা বানাতে গিয়ে দুটো দরজা বানিয়েছিলেন। একটা বড় দরজা, আরেকটি ছোট দরজা । বড় কুকুর বড় দরজা দিয়ে ঢুকবে, ছোট কুকুর ছোট দরজা দিয়ে ঢুকবে।]

চার

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিবারের "গেট টুগেদার" করবো। উদ্যোক্তাদের মধ্যে আমিও একজন। অল্প টাকা চাঁদা নেওয়া হয়েছে। অর্থ সংকট চলছে। ব্যানার বানানোর টাকা নেই। হঠাৎ চোখ গেল অস্থায়ী ক্যাম্পাস (টি টি কলেজ)-এর হলরুমের স্টেজে রাখা পরিত্যক্ত গেটের উপরের অংশের দিকে। ককশীট দিয়ে লেখা রয়েছে "মহান বিজয় দিবস ২০০৯"। গবেষণা শুরু করলাম, এটাকে কিভাবে কাজে লাগানো যায়। গবেষণা ফল দিলো (এতো একাডেমিক গবেষণা নয়, তাহলে নিশ্চিত ফেল মারতাম)। মহান এর "হা" তুলে "মন" বানালাম। বিজয় এর "বি" বাদ দিয়ে "জয়" করলাম। "দিবস" ঠিক রেখে শাহজালালকে (মার্কেটিং-এর অতি অ্যাকটিভ শিক্ষক) বললাম ২০০৯ কে কায়দায় ২০১০ করার জন্য। শাহজালাল মহা উৎসাহে অল্পক্ষণে তা করে ফেলল। হয়ে গেল ব্যানার "মন জয় দিবস ২০১০"। ব্যানার তো হলো কিন্তু ঘাটতি অর্থের কি হবে? যাহোক মান সম্মানের ব্যাপার, পকেট থেকে নিজের টাকা দিলাম। ভাবলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তিরাতো বেশ বড় অংকের চাঁদা দিবেন। ওতে ঘাটতি পুষিয়ে যাবে। যাহোক "গেট টুগেদারের" সন্ধ্যা। প্রচণ্ড শীত পড়েছে। অনুষ্ঠান খুব জমে উঠেছে। সবাই হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক, ফ্যাশন প্যারেড, আবৃত্তিতে মজা করেছে। বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. তুহিন ওয়াদুদের মজার উপস্থাপনায় আর ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক সাজিয়া আফরিনের ক্ষণে ক্ষণে স্টেজে ছুঁটে গিয়ে মজার মজার কথা বলায় সবার হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেছে। কিন্তু আমি অর্থশোকে হাসছি "কেষ্টর হাসি"। যে হাসি মনে কষ্ট নিয়ে কেউ হাসতে বাধ্য হয়, তাকে কি "কেষ্ট হাসি" বলে, হবে হয়তো।

অবশেষে অনুষ্ঠান শেষ। এবার খাওয়া দাওয়ার পর্ব। বাবুর্চি নিয়ে এসে রান্না। সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলেন। খাবার কারো কম পড়েনি। এবার বিদায়ের পালা। আমি না খেয়ে তক্কে তক্কে আছি। বড় কর্তাব্যক্তিরা কখন যাবেন। তখন টাকার কথা বলতে হবে। সরাসরিতো আর বলা যায় না। বলতে হবে অর্থঘাটতির কথা।

যাহোক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় কর্তাব্যক্তি ট্রেজারার স্যারের খাওয়া শেষ। উনি বিদায় নিলেন সবার কাছ থেকে। গাড়ির দিকে এগুচ্ছেন। উদ্যোক্তা হিসাবে তাকে আমি গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছি। এটাই সুযোগ। স্যারকে আস্তে আস্তে বললাম, "স্যার অনুষ্ঠান তো করলাম, কিন্তু কিছু অর্থ ঘাটতি রয়ে গেছে"। শুনে ট্রেজারার স্যার হয়তো আমার কথা না শুনেই বললেন "তাই নাকি, খাবার খুব মজা হয়েছে"। একথা বলে গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। আমি হতবুদ্ধি হয়ে 'অর্থঘাটতি' হলে "খাবার মজা হয়"-এ তত্ত্বটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলাম কিছুদিন। পরে ভাবলাম, হবে হয়তো। এরপরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয়কে অর্থঘাটতির বিষয়ে কিছু বলার আর সাহস পাইনি।

[বিঃদ্রঃ ক্যাম্পাস রঙ্গে লিখিত নাম, পদবী ও ঘটনাগুলো কাল্পনিক। যদি কারো সাথে মিলে যায় তার জন্য লেখক আন্তরিকভাবে দুঃখিত]

নিজ গৃহে পরবাসী

অসীম সীমান্ত

সেবার যখন এইচএসসিতে এ+ পেলাম সারা বাড়ির সবাই কত খুশি। চারিদিকে উৎসবের আমেজ। স্বজনদের প্রত্যেকের হাতে মিষ্টি আর গিফট্ বক্স। রাতে পোলাও-মাংস ও মিষ্টি-দই খাওয়ার পরে সে কি হৈ হুলোর। মা আর আমার কি প্রশংসা। যেমন মা তেমনি মেয়ে। সব কিছুতেই দশে দশ। এত কিছুর মধ্যেও দাদু খবরের কাগজ পড়ছেতো পড়ছেই। প্রায় মাঝরাতে সবাই একটু নিরব হলে আমাকে ডেকে বলল, তোমার রেজাল্টে আমি মহাখুশি। দাদু তোমার যুদ্ধ কিন্তু শেষ হয়নি, শুরু মাত্র। কয়েকদিন বাদে ভর্তি পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পাবে, ভর্তি হবে, হলে থাকবে, অবাধ স্বাধীনতা, বুদ্ধির চর্চা, যুক্তির তীক্ষ্ণতা শিক্ষকদের ক্লাস লেকচার, দিক নির্দেশনা ও স্নেহ-মমতায় প্রকৃত মানুষ হয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে পাবে। তাতেই প্রকৃত সুখ। চোখের জল মুছে দাদুকে বললাম, এ পর্যন্ত সব পরীক্ষায় তো এ+ পেলাম। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে তোমাকে ভাবল এ+ উপহার দিব।

ভাগ্য বলে একটি কথা আছে কিন্তু তা আমার জন্য নয়। দিনে এক ভার্সিটির পরীক্ষা শেষ করে রাতে আরেক ভার্সিটিতে পরীক্ষা দেয়ার জন্য বাসে চেপে বসা। চান্সও হলো। সব ভেবে বাড়ির কাছে নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম। ওরিয়েন্টেশনেই বুঝেছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয় হলো জ্ঞান চর্চার তীর্থভূমি। বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সে অঞ্চলের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বলয়। মুক্তিবুদ্ধির চর্চা আর সহস্র তরুণের দৃঢ় প্রত্যয় ও সংগ্রামের পথ বেয়ে আসে বিপ্লব। শোষণের শৃঙ্খল ভেঙে আসে মুক্তি। তিনশো শিক্ষার্থী, বারজন শিক্ষক ও কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে একটি কলেজের পরিত্যাক্ত দুটি কক্ষে আমাদের যাত্রা শুরু। শুরুতেই বুঝেছিলাম, এ সংসারে প্রথম আসার আনন্দ যেমন অসীম তেমনি কিছুই না পেয়েও সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই অনন্ত প্রাপ্তি ও আত্মতুষ্টি। নাই নাই কোন কিছুই নাই, তাই কারো কোন দুঃখও নাই। সীমাহীন প্রতিকূলতার মধ্যে একটু একটু করে আমাদের বেড়ে ওঠা। বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছি, ভর্তি হতে পেরেছি তাতেই আমাদের আত্মতৃপ্তি। সব অভাবের দেশে সবাই মিলে প্যারোডি গাইতামঃ

'পরের জায়গায় পরের ঘর
পরের ঘরে আমরা রই
আমরা তো সে ঘরের মালিক নই।'

অতি অল্প সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত জায়গাটি ফুলে ফেপে বেড়ে উঠতে শুরু করল। দাদুর কথা মনে হতেই, সেই উৎসবের রাতে ফিরে যাই। অনেক শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও আগত-বহিরাগতের আসা যাওয়া। চারিদিকে নতুন নতুন ভবন, ক্লাস-পরীক্ষা নানা উৎসব। সবাই মিলে এখন আমরা নিজের জায়গায় নিজের ঘরে! এত কিছু আছে মোদের। কিন্তু চারিদিকে শুধু নেই নেই, ভয় ভয় ও আশা নিরাশায় সভয়ে এগিয়ে যাওয়া। আসি যাই। নিজের ঘরে বেশিক্ষণ থাকা হয় না আমাদের। পথের ধারে কারো টিনসেডে অথবা পাকা বা আধা-পাকা ঘরের এক কোণায় আমাদের বন্দি জীবন। যে আমি কোনদিন বাবা-মায়ের কাছ থেকে এতটুকু বকা খাইনি, সেই আমি সকাল সন্ধ্যা শত রক্তচক্ষু, তিরস্কার ও নানা নিয়ম সহ্য করে চলি। ভার্সিটিতে যেয়ে লাইব্রেরিতে বসে একটু পড়ব তা কি সম্ভব! নামমাত্র লাইব্রেরি। একসাথে বিশের বেশি বসা অসম্ভব। বইয়ের সংখ্যাও হাতে গোনা। একটু দেরি হলেই অন্যজন তুলে নেয়।

কী আর করা! পড়ালেখা নাইবা করলাম। ভার্সিটির মাঠে একটু ছেলেদের খেলাতো দেখা যায়। মাঠে গিয়ে দেখি এরা লোকাল ছেলে। আহা! খেটে খাওয়া নানা পেশার বঞ্চিত ও অবহেলিত শ্রমিক এরা। ভার্সিটির ছেলেরা কত মানবিক, এদের মাঠগুলো খেলার জন্য ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া ওদের সাথে কথা বলতে গেলেই হট্টগোল বেধে যায়। চারিদিকে কত গাছ লাগানো হয়েছে। সেগুলো না হয় একটু

দেখি। কবে কৃষ্ণচুড়া ফুলে ফুলে লাল হবে, তাজা বকুলের মালা গাথব। ওমা এগুলো কী! খুটি আছে তা গাছ নেই। গাছ আছে তো অনেক ছোট। মনে হয় মাত্র বীজ থেকে বের হলো। তাতে কী? ছোট গাছগুলো একদিন শিকড় শক্ত করে অনেক উঁচু হয়ে ক্যাম্পাসের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। প্রবল ঝড়েও ভেঙে পড়বে না। উত্তর -দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সব দিকেই নতুন বিল্ডিং। আমাদের হল উত্তরে। বন্ধুদের হল দক্ষিণে। স্যারদের জন্য নিশ্চয়ই হবে। সেই কবে আমাদের হলের কাজ শুরু হয়েছিল কিন্তু তেমন কোন অগ্রগতি নেই। অথচ পাশেই একটি ভবনের কাজ অতিদ্রুত প্রায় শেষ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই উঁচু তলার কেউ এখানে থাকবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও মনে হয় ভালোই হবে। মূল প্রবেশ দ্বারেই পুলিশ ক্যাম্প! শুনেছি, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ক্যাম্পাসের মধ্যে পুলিশ ক্যাম্প থাকে না। অথচ আমাদের হবে। নিশ্চয় এখানে সভ্য পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন। ক্যাম্পাসের বেশ উন্নতি হয়েছে। কত সুন্দর দেখাচ্ছে। এবার ঈদের ছুটিতে বাড়িতে যেয়ে দাদুর সাথে কত গল্প করবো। আচ্ছা ঈদের ছুটি কয়দিন! মাত্র সাতদিন! বেশ ভালো সেশন জট হবে না। তাছাড়া বেশি ছুটির দরকার কী? ক্যাম্পাসে তো কতই অনুষ্ঠান হয়। ঈদের আনন্দের এত কী দরকার? পড়ন্ত বিকেলের সোনালি আভায় ক্যাম্পাস কী অপরূপ রূপে সেজেছে। এমন সময় ক্যাম্পাস পত্রিকাটা কাছে থাকলে সময়টা বেশ ভালোই কাটতো। মাসিকটির গত সংখ্যাটা তো পেলাম না । আচ্ছা কখন কি এমন হতে পারে কেউ প্রকাশনাটি বন্ধ করে দিতে পারে। নিশ্চয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চা হয়। এখানে কোনদিন মেধার মৃত্যু হয় না। ছেলেগুলো খেলা শেষ করার আগেই ফিরতে হবে। খেলা শেষে ক্যাম্পাসেই হোক আর রাস্তার মাঝেই হোক টিজ করবেই। প্রতিদিন ওদের সামনে দিয়ে কতবার আসা যাওয়া। শুধু এদের দোষ কি হবে। সারাদেশেই তো একই অবস্থা। প্রক্টর স্যার বলেছেন, প্রাচীরটা হয়ে গেলে এদের আর ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। মেইন গেটে পুলিশ ক্যাম্প কার সাধ্য ভিতরে আসা!

সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। এখন তবে যাই, কাল একটা কোর্সের মিড-সেমিস্টার। অন্য একটা কোর্সের কুইজ। মোট তিনটা ক্লাস। তা তো থাকবেই। আধুনিক যুগোপযোগী মানসম্মত সিলেবাস অনুযায়ী পড়ছি। পড়তে তো হবেই। স্যারেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নতুন হলেও নিশ্চয় সবকিছু বিবেচনা নিয়ে প্রোগ্রাম ডিজাইন করেছেন। সবই আমাদের ভাগ্য। বাইরে থেকে যাচ্ছি, কিছু নিয়ে যাই, রাতের খাবার যদি মুখে দেওয়া না যায়। আজ আবার যদি দারোয়ানজি জিজ্ঞেস করে, ফিরতে সন্ধ্যা হল কেন? বলব, দাদু নিজ গৃহে পরবাসী আমি। যা বল বল, কিছুই বলবনা আমি।

Trip to 'Vinno Jogot'

'Let's get missing somewhere'

Asif Al Matin, Lecturer, Dept of English, BRUR

A trip is always like such a pleasant occasion for me and if it would be in a place like 'Vinno Jogot' (A theme park) then the joys are boundless. I was feeling very much exhausted with the daily monotonous tasks before some days. At that moment a blessing had come to me from some of my dear students. They were also planning to have a change, finishing their examination. When they had come to me with the request I had just grabbed that without any second thought. We had planned to go somewhere, where we can spend the whole day and which is not far from Rangpur. Then it was decided to go to Vinno Jogot, because this was the closest place from here to be in our own world. It was very exciting for me, because I had never been there before. After a little preparation we had made that happened on 30 July.

The weather was really very much encouraging to us, as there were clouds in the sky and always it was making a feeling of getting lost to the mysterious world. It started drizzling at the moment of our starting. After a while when we left the town we found a wonderful environment on the high way even almost at the noon. It took maximum forty five to fifty minutes to reach there. We had to buy tickets for all of us and the vehicle which had took us there. The arrangements were quite well inside the park. We took our meal with us, so that we didn't need to depend upon others. We started visiting the place in a group. The whole park was full of different type of trees, ponds, some artificial statues of different animals. There was an interesting cave also. We had enjoyed some of the rides there, which were full of fun. Thus in the afternoon we had finished by paddle boating.

Almost two weeks later when I recollect the memories of the trip it gives me a lot of encouraging energy. Now a day when we are so much busy with our various affairs, these types of trips can give us the essence to live, to enjoy the life. When people are not getting any time for kith and kin, these trips can be the way of being all together. These trips can play the role as the redeemer in our mechanical lives.

I heartily thank the editorial body of 'Goongoon' for giving me the opportunity to share this experience.

চিঠি-৩

বৃষ্টির ইতিহাস

আলী রায়হান সরকার, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, বেরোবি

বৃষ্টির প্রচণ্ডতায় মানুষগুলো সব আর্দ্র হয়ে গেছে। চারিদিকে মানুষের মধ্যে আর্দ্রতা। মনে হচ্ছে পৃথিবীর কোথাও শুষ্ক মানুষ নেই। মরুভূমির আর্দ্রতামাপক যন্ত্রগুলো আজ ধুলিকণায় আর্দ্রতা ছড়াচ্ছে। আমি এক আর্দ্র মন নিয়ে এসব পর্যবেক্ষণ করছি আর লিখছি, তাও এক আর্দ্র কাগজে। আজ মানুষের যখন এমন অবস্থা তখন পৃথিবীর অন্যান্য জীবসকল ও জড়সকলের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। লোহাও এখন পানি শুষে নিতে শিখে গেছে। পানি এখন কলমের নিব থেকে অতিরিক্ত কালি বের করে নিচ্ছে। পানি শুষে নিয়ে মানুষসহ অন্যান্য জীব ও জড় ফুলে ফেঁপে উঠছে। এই স্ফীতি পৃথিবী সহ্য করবে তো? আকাশের দূরতম কোন শব্দাধার থেকে মেঘের গর্জন ভেসে আসছে। এর আগে ঐ দূরতম স্থানের কোন আলোকাধার থেকে প্রচণ্ড আলো এসে ধুয়ে দিচ্ছে পৃথিবীর মানুষ, জীব, জড়, পদার্থের শরীর। পৃথিবীর স্ফীতকায় মানুষ, জীব ও জড় সকলে মিলে শুষে নিচ্ছে শব্দ ও আলোর প্রাচুর্য। বৃষ্টির এক একটি ফোটা কত দূরতম স্থান থেকে কত বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে এসে পড়েছে পৃথিবীর কোন উপাদানের উপর। হয়তো প্রথম এসে পড়ছে কোন এক গাছের কোন এক পাতার উপর, তারপর আরোও আরোও অনেক বৃষ্টির ফোটার সঙ্গে মিলিত হয়ে আরোও অনেকগুলো গাছের পাতা পরিভ্রমণ করে শেষে সত্যির পৃথিবী মাটিতে আছড়ে পড়ছে। সেখানে তার কিছুক্ষণ স্থিতি। তারপর গন্তব্য কোথায় সে জানে না। কোন একটি ফোটা হয়তো এসে পড়েছে সোডিয়াম লাইটপোস্টের উপর। পড়েই পতনের প্রচণ্ডতায় সেই ফোটাটি শত শত খণ্ডে বিশ্লিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মিলে যাচ্ছে অন্য লক্ষাধিক ফোটার সঙ্গে। কোন কোন ফোটা হয়তো কোন এক ঘরের ছাদে নিরাপদ অবতরণ করছে এবং স্বভাবতই মিলিত হচ্ছে অন্যান্যদের সঙ্গে। কিছু কিছু ফোটা সরাসরি অবতরণ করছে সত্যিকার পৃথিবী অর্থাৎ মাটিতে। তারা সুখি। আমি দেখছি প্রতিটি বৃষ্টির ফোঁটার একটা ইতিহাস আছে।

শিকড়কে চিঠিতে।

বৃষ্টি দিনে অশ্রু ঝরে

মোঃ শাহ্‌জামান
প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, বেরোবি

আকাশের সাথে মানুষের মনের বোধ হয় একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। তাইতো কবি-সাহিত্যিকগণেরা 'মনের আকাশ' বা 'হৃদয়ের আকাশ' শব্দটি কখনও কখনও তাদের কবিতা ও সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু আমি একটু অন্যরকম বুঝি। আমরা জানি আকাশে কালো মেঘ জমে বা আমি যদি বলি আকাশ নিজেই কালো মেঘ ডেকে আনে কারন কেউতো কখনও চায়না পুরোনো জিনিসকে আলিঙ্গন করে সবসময় নিজের কাছে রাখতে। তাই পুরোনো চাঁদটা নতুন করে দেখতে কেমন লাগবে তাই বোধই তার এই প্রচেষ্টা। বিবাহিত ব্যক্তিগণ হয়তো নতুন করে অন্য কিছু ভাবতে পারেন। যাই হোক আমি এই প্রথম বোধই কোন রকম বিষয়বস্তু ছাড়াই অগোছালোভাবে লিখছি এবং তাও আবার গুনেগুনে প্রথম লেখায়, মনে কিছু তো নিতেই হবে। তাই নিজের কাছে ক্ষমা চেয়ে সবাইকে পূর্ণ্য করলাম। কে না জানে মেঘ থেকে ওই বৃষ্টি হয় এবং খানিক পরেই সমস্ত আকাশ পরিস্কার ও শুদ্ধি লাভ করে। কিন্তু মনের আকাশে কালো মেঘ জমলে তা সরে যেতে অনেক সময় লাগে। আকাশ পারে তার বেদনাগুলোকে মেঘ করে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করাতে। কিন্তু ঐ আকাশটা বোবা বলেই আমরা তার যন্ত্রণা বা বেদনার কথা ভাবিনা, শুধু বৃষ্টি পেলেই আনন্দে মেতে উঠি। আমাদের মাঝে এমন অনেক মানুষ আছে যারা হাসতে পারেনা, চাইতে পারেনা কিন্তু আমরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কারো দিকে চেয়ে দেখিনা। কোন বস্তু যেমন নিজে থেকে চলতে পারে না তাকে বাহির থেকে বল প্রয়োগ করে চালাতে হয় তেমনই কোন মানুষের বড় হবার পেছনে কারও কোন না কোন অবদান থাকে। মা এমনই একটা শব্দ যার উচ্চারণে বুকের ভেতর এক অনাবিল শিহরণ জেগে ওঠে। দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। মায়ের কথা আসলেই দুটি গানের কলি আমার মনে বার বার ভেসে আসে-

'মা মাগো মা আমি এলাম তোমার কোলে
তোমার মায়ায় তোমার ছায়ায় মানুষ হবো বলে।'

হয়তো আমি একটু বেশি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ছি। তাইতো অশ্রু জমছে নয়নে। এবার রোমান্টিকতায় আসা যাক। এই বিভাগটিতেও কিন্তু অশ্রুর কমতি নেই। বৃষ্টির টাপুর-টুপুর শব্দ কার না ভাল লাগে। ভাল লাগে বাড়ির বারান্দায় বসে চানাচুর মুড়ি মাখিয়ে খেতে। বৃষ্টি-মুড়ির চমৎকার শব্দে মনটা মাখতে। আমার মনে আছে বৃষ্টি ভেজা বর্ষার এমনই এক দিনের কথা যেদিন আমি ও আমার অন্তরাত্মা এক হয়ে কেঁদেছিলাম। বৃষ্টিও হার মেনেছিল সেদিন। বাড়ির সবাই যখন বারান্দায় বসে চানাচুর-মুড়ি খাচ্ছে ও মজা করছে ঠিক সে সময় বাড়ির অন্য এক সদস্য অনুপস্থিত। এক টানা বৃষ্টি ঝরার পর জানালা খুলতেই দেখি সোনালি রোদের ঝিকিমিকি আলো আমার চোখের জলকে দেখে যেন উপহাস করছে। আর আমার মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছে। সেদিন হয়তো মনে হয়েছিল-

'প্রেম আর জীবন তো একটাই
প্রেম না হলে কি থাকে বলো জীবনটায়।'

প্রিয় মানুষটির কান্না ভেজা চোখ দেখলেই চোখে জল চলে আসে। মনে হয় সকল ভালাবাসা উজাড় করে দিয়ে হলেও চোখের জল মুছে ফেলতে। মনে হয় তার কান্না যেন আবেগ জড়ানো দু'চোখে ছড়ানো পান্না। তাহলে আমার এই ভালবাসা শুধু কি প্রেমিকের, মা-বাবা এবং সন্তানের জন্য? দেশের মাটির কাছে আমাদের কিছু চাওয়ার নেই, দেয়ারও কি কিছু নেই? প্রশ্ন রইল সবার কাছে। আসুন আকাশের মতো আমাদের মনে অহংকার ও গ্লানির যত কালো মেঘ জমেছে সেগুলো বৃষ্টি দিনে বর্ষণ নিজেকে অমানবতার কলুষ থেকে মুক্ত করি। দোয়া করি তাদের জন্য যারা হয়েছে গত, মনে করিয়ে দেয় প্রতিনিয়ত- কি আমার লক্ষ্য- মানুষ হিসেবে।

আমি আগেই বলেছি মনের আকাশের কালো মেঘ সরে যাবার নয়। ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু দিবস। জাতীয় শোক দিবস। এই দিনটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায়। বাঙালি জাতির মনে রাষ্ট্রদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকেরা যে কালো দাগ একে দিয়েছিলো তা সহজে মুছে যাবার নয়। ভাবতে অবাক লাগে আজ এত বছর পর বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে। তবুতো হয়েছে। তা না হলে জাতি হিসেবে বিবেকের তাড়নায় আমরা তাড়িত হতাম। এখন আমরাই পারি বঙ্গবন্ধুর আত্মাকে শান্তি দিতে- বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে ও সত্যিকারের সোনার বাংলা গড়ার মাধ্যমে। তখন হয়তো আমাদের কাছে মনে হবে বঙ্গবন্ধু আজো বেঁচে আছেন।

'মানুষের মাঝে তুমি চির অম্লান
কিষাণের কাছে তুমি নব উত্থান
তোমার কৃতি তুমি আছো বহমান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।'

কিন্তু আমরা আজ কি দেখছি, কি শুনছি? যেই দেশ ও ভাষার জন্য লাখো মানুষ জীবন দিয়ে শহীদ হয়েছিল, যেই ভাষার জন্য আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়, সেই জাতি নিজেই নিজেকে সম্মান প্রদর্শন করতে পারে কি? তা না হলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কেন আমাদের এত সংশয়, কেন আমরা এখনও নিজেকে তাকে নিয়ে প্রশ্ন করি? মিথ্যা কথা বলা কবীরা গুনাহ্। মিথ্যা ইতিহাস রচিত করা তাহলে কি? হাজার মিথ্যার মধ্যে সত্য একদিন কাল হয়ে বের হবেই এবং বাঙালি জাতি তা ভাল ভাবেই জানে। তাই আসুন বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যারা প্রশ্ন তোলে, তার আদর্শের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াই। আর তাও যদি না পারি তাদেরকে ঘৃণা করি। একদিন বঙ্গবন্ধুর আদর্শে আলোকিত হয়ে আমরা একটি সুন্দর ও সম্ভাবনাময় সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। এই আশায় বুক বেধে রইলাম।

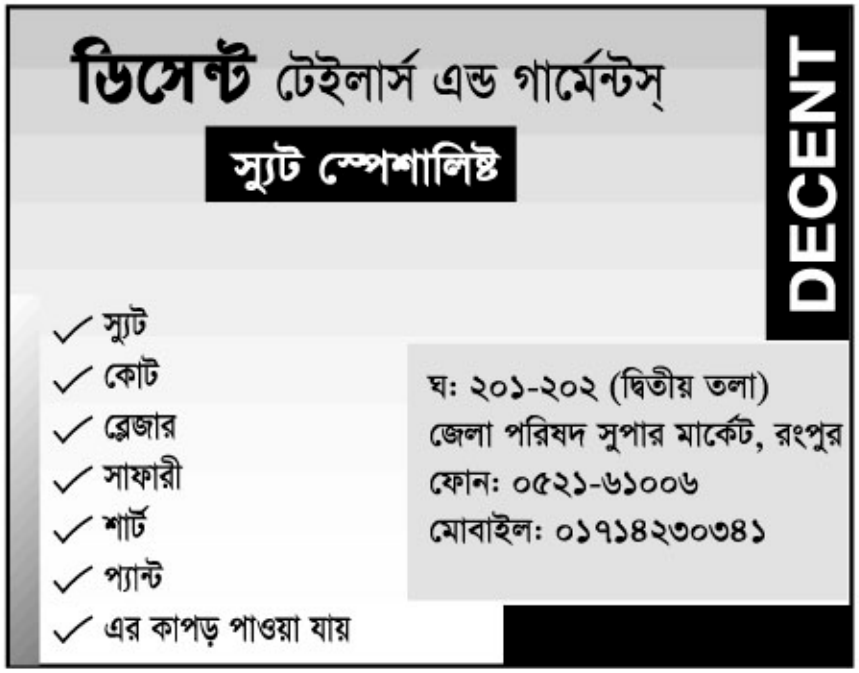

আমি একজন নারী বলছি

অংকন জাহান

'জীবন যুদ্ধে আজ একজন পরাজিত সৈনিক আমি, বয়সের ভারের মতো আমার জীবনটাও আজ যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত। আমি আর দশটি সাধারণ মেয়ের মত জীবন যাপন করতে চাইনি। ছোট্টবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতাম, নিজের পায়ে দাঁড়াব, মনের ইচ্ছাগুলোকে নিয়ে পাখির মতো স্বাধীন ভাবে বাঁচবো। আমি জানতাম, পুরুষ শাসিত সমাজের অনেকেই চাইবে আমার এই স্বাধীনতাকে যাতাকলের মতো তাদের পায়ে পিষে ফেলতে। তারপরও আমি ভয় পেয়ে পিছনে ফিরে যেতে চাইনি, বাধ্য করা সত্ত্বেও ইচ্ছাগুলোকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারিনি।' কিন্তু আজ– এই কথা বলে তিনি একটু হাসলেন। বুঝতে কষ্ট হলো না তার এই হাসির অর্থ কী। তারপরও আমার কৌতুহলকে দমন করতে না পেরে তার কাছ থেকে তার জীবনের কথা, আত্মগ্লানির কারণ জানতে চাইলাম।

আমার কথা শুনে তিনি সংক্ষেপে তার জীবনের কথা বলতে শুরু করলেন– এক রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারে জন্ম আমার। জন্মের সময় সবাই চেয়েছিল পরপর চারটি মেয়ের পর এবার নিশ্চয়ই ছেলে হবে, কিন্তু তাদের সেই আশাকে মাটি করে পৃথিবীতে জন্ম হলো আমার অর্থাৎ আবার একটি কন্যা সন্তানের। অবশ্য আবার কন্যা সন্তান জন্ম দেবার জন্য আমার হতভাগিনী মাকে কম কথা শুনতে হয়নি। অন্যান্য মেয়েদের মত তিনিও কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াকে নিজের দোষ বলেই মেনে নিলেন। আমাদের পরিবারের প্রধান ছিলেন আমার ধর্মভক্ত দাদা। আধুনিক যুগে এসেও পরিবারের সদস্যদের মন মানসিকতা ছিল প্রাচীনকালের মত পুরোনো, জড়ীভূত। পুরাতনকে পরিত্যাগ করে নতুনকে গ্রহণ করতে তাদের ভয় হতো। সঙ্গত কারণে এই পরিবারে আমার ইচ্ছাগুলো পূরণ করা অনেক কঠিন ছিল। আমার বয়স যখন প্রায় ১৬ বছর, ঠিক হলো অন্যান্য বোনদের মত আমাকেও বিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বিয়ের পিঁড়িতে বসার কোনইচ্ছা আমার ছিল না। বলেওছিলাম এই কথা, শোনা মাত্র বড়রা অনেক কথা বলতে লাগলো। যত কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যায় ততই নাকি ভাল। মেয়েরা বিয়ে করে স্বামীর সেবা করবে, সবসময় তার কথা শুনবে, সন্তান পালন করবে এটাই নাকি মেয়েদের জীবন। আমি তা মেনে নিতে পারলাম না। আধুনিক যুগে এসে আমি তো দেখছি অন্যান্য মেয়েদের, বিয়ে না করেও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে চলতে। আমি এইসব মেয়েদের মত হতে চাই, শুনে সবাই বললো এরা কখনো সুখী হয় না। জান্নাতের দরজা তাদের জন্যে চিরকালের মত বন্ধ, স্বামীর পায়ের নিচেই নাকি জান্নাত। শুনে অবাক হলাম, কি বলে এসব এরা! ভাবতে কষ্ট হলো যে, এই পরিবারে আমার জন্ম।

আমাদের পরিবারে মেয়েদের লেখাপড়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আমার বন্ধুদের কাছ থেকে আমি লেখতে, পড়তে শিখি। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আমার সে রকম না হলেও নিজের চেষ্টায় দেশী বিদেশী অনেক লেখকের বই আমি পড়েছি। এসব বই আমাকে আরো স্বপ্ন দেখাতো। ফলে বিয়ে করাটাকেই মেয়েদের একমাত্র সাধনা না ভেবে, বলতে গেলে বিয়ের হাত থেকে বাঁচতেই কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে পালালাম। এক বুক স্বপ্ন নিয়ে অজানা পথে পা বাড়ালাম। আমি তখনো ভাবিনি, জীবনের রাস্তা এত কঠিন। কোথায় যাব, কার কাছে যাব, কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল আমার, আবার ভালোও লাগছিল এই ভেবে যে আমি আমার মতো করে বাঁচতে পারবো। কেউ আর আমাকে বিয়ের কথা বলবে না। বাসে করে গেলাম ঢাকা শহরে। আজব শহর, সবাই যেন ছুটছে আর ছুটছে, ভেবে পেলাম না কেন তারা ছুটছে। আমি এক জায়গায় বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিছু লোক আমার দিকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে আছে। এই কথাটি বলেই মহিলা আবার একটু হাসলেন। আমাকে বললেন, বোঝেন তো কেন তারা এইভাবে তাকাচ্ছিল, একে আমার বয়স কম, তারপর ভরা

যৌবন। অকথ্য ভাষাও শুনতে পেলাম, কিন্তু কিছুই গায়ে তুললাম না। কারণ আমি জানি, মেয়েদের দেখলেই কিছু কিছু পুরুষদের পশুত্ব গাছপালার শাখার মতো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমাকে এই অবস্থায় দেখে এক ভদ্রলোক দয়াবশত তার বাসায় নিয়ে গেলেন। লোকটি আমাকে তার মেয়ের মতো দেখতেন। তিনি আমাকে পড়াশুনা করতে আরো বেশি উৎসাহী করলেন। তার কাছে আমি প্রায় ৬ বছর ছিলাম। ভালোই ছিলাম সেখানে, কিন্তু সুখ যে আমার কপালে ছিল না। একদিন বাসায় দেখি আমার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। জানি না কি করে তিনি আমার ঠিকানা পেয়েছেন। তাকে দেখেই ভয় পেলাম। তিনি আমাকে জোর করেই বাড়ি নিয়ে গেলেন। তার ঠিক সাতদিন পরেই আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করেই বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর আমার স্বামী আমার ইচ্ছাগুলোকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চাইলো। সে চাইতো আমি তার কথা সব শুনবো। সব সময় তার পায়ের কাছে বিড়ালের মতো মিউ মিউ করে থাকবো। আমার স্বামী কি কাজ করতো আমি জানতাম না, জানার কোন ইচ্ছাও কোনদিন হয়নি। সে ছিল আপাদমস্তকে একজন বিবেকহীন, মনুষ্যত্বহীন নামেমাত্র মানুষ। আমি ভাবতেও পারিনা মানুষ কি করে এমন হতে পারে। রাতে আমি তার প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া না দিলে সে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করতো, মেরেওছিল প্রথম দিকে। অন্যান্য মেয়েদের মত এসব অত্যাচার সহ্য করার মতো মেয়ে আমি ছিলাম না। ফলে সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে ডিভোর্স দিবো। শেষ পর্যন্ত তাই করলাম। চলে এলাম আবার বাবার বাড়িতে, যদিও অনেক কথা শুনতে হয়েছিল। সব অপমান সহ্য করে, সিদ্ধান্ত নিলাম নিজে কিছু আয়-রোজগার করবো। জানতাম এই কাজে আমাকে কেউ সাহায্য করবে না। তারপরও নিজের সাহস, উদ্যমকে পুঁজি করে তার সাথে ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে বাড়ির পাশেই গরুর খামার শুরু করলাম। প্রথম প্রথম একা হাতে সবকিছু সামলাতে খুব কষ্ট হতো। তারপরও সহজে হাল ছেড়ে দিতে চাইনি। বছর পাঁচেক পর আমার গরুর সংখ্যা দাঁড়ালো ১৭টা । বুঝতে পারতাম আমার সাফল্যে নিন্দুক, হিংসুকদের কষ্ট হতো। আমার চারপাশে আমার নিন্দা করার মতো লোকের অভাব ছিল না। হঠাৎ একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যা দেখলাম, তাতে নিজের চোখকে বিশ্বাস করাতে কষ্ট হলো। আমার সব গরু মেঝেতে লুটিয়ে আছে। তিলতিল করে গড়ে তোলা আমার খামারে অবস্থা দেখে, পাগলের মতো চিৎকার করে কেঁদেছিলাম। আমাকে এই অবস্থায় দেখে অনেকে আনন্দ পাচ্ছিল। ভয়ঙ্কর দিনটির কথা মনে পড়লে আজও আমার সারা শরীরে শিহরণ বয়ে যায়।

আমার কাছে কথাগুলো বলে দেখলাম তিনি আঁচল দিয়ে তার চোখের পানি মুছছেন। তার কণ্ঠে কান্নার ভারী আওয়াজ, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ আমার বুকে শীলাঘাত করতে লাগলো। তিনি আর কোন কথাই বলতে পারছিলেন না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন আমার দিকে। তার চোখের ভাষা বুঝে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। বেরিয়ে এলাম বকুলতলা বৃদ্ধাশ্রম থেকে। সারা রাস্তা ভাবলাম তার কথা, এই কষ্টটা তাকে পাগল করে তুলেছিল। কয়েক বছর তিনি নাকি মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন। এক লোক তাকে এই আশ্রমে রেখে যান। ধীরে ধীরে তিনি স্বাভাবিক হন। তারপরও জীবনের কথা ভাবলে তিনি ভয়ে আজও কুঁকড়ে ওঠেন। মানুষের প্রতি তার আক্ষেপ তো অন্যায় কিছু নয়। কি দিয়েছে এই সমাজ, মানুষ তাকে? এই নারীর সাহসের মূল্য কি দিতে পেরেছে এই পুরুষ শাসিত সমাজ? পেরেছে তাকে তার যোগ্য সম্মান দিতে? পারেনি। ভালোবাসার মূল্যও তিনি পাননি। তার কাছেই শুনেছিলাম ঢাকায় থাকতে তিনি পাশের ফ্লাটের এক তরুণকে ভালোবেসেছিলেন। বিনিময়ে তার কাছ থেকে পেয়েছিলেন শুধুই প্রতারণা।

আজ অফুরন্ত অবসরে তিনি তার ফেলে আসা দিনগুলোর কথা ভাবেন, আর নীরবে তার কপোল বেয়ে অজস্র অশ্রু বয়ে যায়। হঠাৎ আমার মনে হলো এই বৃদ্ধা মহিলার নামতো জানা হলো না। জীবন যুদ্ধে হলেনইবা তিনি পরাজিত কিন্তু আমার কাছে তিনি একজন সাহসী, জয়ী নারী ।

একজন আধুনিক পণ্ডিতমশাইয়ের গল্প

জিনাত শারমিন, প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, বেরোবি

ট্রেন ছাড়তেই সাঈদ আরাম করে সিটে বসল। যাক শেষ পর্যন্ত ঢাকা যাওয়া হচ্ছে। বই কেনাটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছিল। রংপুরে অবশ্য কিছু ভাল বইয়ের দোকান আছে। যারা অর্ডার দিলে ভাল বই এনে দেয়। কিন্তু নিজে না দেখে বই কেনাতে ঠিক সুবিধা বা পছন্দ কোনটাই হয়না সাঈদের। ঢাকা যাওয়া আসা সব মিলিয়ে যে খরচ, বেতনে সংসার চালিয়ে তা আর সম্ভব হয়না। ওদিকে আছে আবার ছোট ভাইটার পড়ার খরচ। প্রতি মাসের শেষের ৮-১০ দিন সংসারে চলে প্রচণ্ড টানাপোড়েন। তাও রিমার মত বউ আছে বলেই রক্ষা। ঢাকা ছেড়ে আসার সময় ভেবেছিল রংপুরতো ছোট শহর, বেতনের টাকা কম হলেও হয়তো অভাব হবেনা। কে জানত, বিভাগীয় শহর হতে পারার প্রথম ধাক্কাটাই লাগবে বাড়ি ভাড়া ও জিনিসপত্রের দামে। এদিকে আবার এমন চাকুরী বই না কিনলেও চলে না। সব মিলিয়ে সাঈদ আর পেরে উঠছে না। কেন যে বেসরকারি চাকুরীটা ছেড়ে এখানে এলাম। "উফ! কি গরম বাবা"। পাশের জনের বিরক্ত মেশানো গলার স্বর চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিল। কেন যে এসেছিলাম এখানে! কাজও হল না, অযথা কষ্ট। ভাই কিছু মনে করবেন না, কতক্ষণে ঢাকা পৌছাব বলতে পারেন? যতদূর জানি সকাল ৭-৮ টার দিকে। ওহ বাবা! ততক্ষণে তো মারাই পড়ব। সাঈদ ভাল করে লোকটার দিকে তাকাল। প্রচণ্ড আরামে থাকলে যে ধরনের শরীর হয় তেমনী একটা শরীর। এসি ছাড়া থাকার অভ্যাস নাই হয়তো। প্রশ্নটা করেই ফেললাম, আপনি এসি বাসে যেতে পারতেন। তা আর চেষ্টা করিনি ভাবছেন? প্রথমে কথা ছিল মাইক্রোবাসে যাব। সড়ক পথে ধর্মঘট, গণ্ডগোল। ট্রেনের-বাসের সব টিকেট বিক্রি শেষ। যাওয়াটা খুব জরুরি। কোনমতে এই টিকেটটা পেলাম। ও আচ্ছা! পরিচয়টাই হয়নি। আমি আবরার রহমান। আমার নাম সাঈদ চৌধুরী। আমি আসলে কোম্পানীর একটা কাজে রংপুরে এসেছিলাম। ফিরে যাওয়ার সময় এই ঝামেলা। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে কাজ করি।

আপনি?

আমি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক।

যা বাবা! বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তো অনেক সম্মানের চাকুরী?

মাসের শেষের টানাটানির দিনগুলোর কথা মনে হলেও সাঈদ সৌজন্যের হাসি হাসল। পাশেও তৃপ্তির হাসি–ভালই হল, আপনার সাথে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। আমিতো ভয়েই ছিলাম। ট্রেনে আমার পাশে কে না কে বসে! বুঝতেই পারছেন অভ্যাস নেই তো!

আপনাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কেমন চলছে? কোয়ার্টার পেয়েছেন?

ভালই চলছে। এখনও থাকার কোন ব্যবস্থা নেই । আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি।

আমার বাসাটা গুলশানে। অবশ্য কোম্পানি ভাড়া দেয়। দু'সন্তান। দু'জনই সানি ডেলে পড়ে। একটা ড্রাইভার আছে তাদের আনা নেয়া করে। ভাবছি ধানমন্ডিতে একটা ফ্লাট নিয়ে নেব। বাচ্চাগুলোর অনেক দূর হয়ে যায়। আবার ধানমন্ডি ঠিক গুলশানের মত অভিজাত নয়। অবশ্য ড্রাইভার ঠিকমতই ওদের স্কুল- কোচিং এ পৌছে দেয়। সারাদিন শুধু ওদের জন্য স্ট্যানবাই ড্রাইভার রাখা। প্রতিমাসে ড্রাইভারের বেতন বাবদই খরচ হয় ১৫০০০ টাকা। এছাড়া বকশিস তো আছেই। তবে যে যুগ পড়েছে, বিশ্বস্ত লোকও তো পাওয়া কঠিন, কি বলেন?

তা তো অবশ্যই ! উত্তর দিতে গিয়েই সাঈদের মনে পড়ে গেল প্রভিডেন্ট ফান্ড কেটে মাসে আসে ১৭০০০ টাকা। তা থেকে চলে যায় ৫০০ টাকা বাচ্চাটার জন্য খোলা শিক্ষা স্কীমে, ৩৫০০ ভাইটার

পড়ার খরচ, ২০০০ টাকায় বাবা-মার ঔষধ, বাকি টাকায় টেনেটুনে কোনমতে সংসার। বছরে একবার খাতা দেখা-পরীক্ষার টাকাগুলো যেন ঈদের চাঁদের মত। সারাবছরের ধার শোধ করে হাতে যা থাকে তা না থাকার মতই। তাহলে কি আবরার সাহেবের ড্রাইভারের সংসার তার চেয়ে স্বচ্ছল ? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সম্মান নাকি অনেক, সে সম্মান কি পারে তার মাস শেষের দীর্ঘশ্বাসটুকু ঢাকতে? তার সন্তানকে আবরার সাহেবের বাচ্চাদের মত একটা স্কুলে পড়াতে?

স্লামালিকুম স্যার। ভাল আছেন? এখানে তো গরমে ঘেমে গেছেন, আমার সিটে চলেন স্যার। ওটা জানালার পাশে।

তাকিয়ে দেখে তার ছাত্র রিটন। রিটনের চোখে-মুখে স্যারের জন্য কিছু করার প্রবল আগ্রহ। রিটনের দিকে তাকিয়ে সাঈদের মনে হল সম্মান নয়, বেতন নয়, এটুকু ভালবাসা পাবার জন্যই হয়ত শিক্ষক হওয়া যায়।

উদ্‌ভ্রান্ত

শফিক আশরাফ, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, বেরোবি

কাকের কর্কশ কাঁ কাঁ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মামুনের। বালিশের নিচ থেকে ঘড়ি বের করে দেখে সকাল ৯টা। আজ কত তারিখ? শুয়ে শুয়ে দেয়ালে ঝুলানো ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ রাখলো। ১৮ জানুয়ারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে বাড়ি চলে গেছে। ঈদের ১৫ দিন আগে থেকে যাওয়া শুরু আর ফিরে আসে ১৫ দিন পর এ যেন ট্র্যাডিশান হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাপারটা।

বেলা ১১টার দিকে শামীমা ও রূপা চলে যাবে। ওদের বিদায় দেয়ার জন্য যাওয়া দরকার। মামুন শব্দ করে হাই তুলে উঠে বসে। জানালার কার্ণিসে বসে কাকটা আবার ডেকে উঠলো।

হেস্ ... যাঃ ... শালার, মনে হচ্ছে সমস্ত হলে কাকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। কাকের কাঁ কাঁ শব্দে নাকি অমঙ্গলের বাণী- যতসব ভাওতামী কথাবার্তা। বিছানার উপর থেকেই হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ব্রাসে পেস্ট লাগালো মামুন। একটু তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। অনেকদিন দেখা হবে না বান্ধবীদের সাথে খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে মুখ ধুয়ে, সেভ করে, গোসল সেরে বেরিয়ে পড়লো মামুন।

-এই মামুন! এসেছিস?- তোর জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। শামীমার কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। শোন, রূপা তার এলাকার এক বান্ধবীর সাথে চলে যাবে। তুই আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসবি।

অকারণে মন খারাপ হয় মামুনের। মাত্র কয়েকদিনের জন্যেই তো চলে যাচ্ছে। ঈদের পর আবার দেখা হবে। -তুই কি প্রেমে পড়লি? শা... লা মামুন নিজেকেই গালি দেয় মনে মনে।

-ঠিক আছে, তুই চিন্তা করিস না। ব্যাগ-ট্যাগ গুছিয়ে তৈরি হ, আমি একটু ঘুরে আসছি। এই বলে ইবলিশ কর্ণারে এসে চায়ের অর্ডার দেয়। ইবলিশ কর্ণার? মামুনের ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা যায়। এটা প্রেমিক প্রেমিকাদের আড্ডা মারার জায়গা বলেই হয়েতো বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ত্রাস-দাঁড়ি-টুপিওয়ালাদের এই নামকরণ। চা শেষ করে, একটা সিগারেট ধরিয়ে ব্যর্থ প্রেমিকের মত উদাসীন ভঙ্গিতে এসে বসে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বারান্দায়। সন্ধ্যার পর ডাইলখোরদের উৎসবে মুখর হয়ে ওঠে জায়গাটা। অর্ধেক রাত্রি পর্যন্ত চলে সেই অসুস্থ উৎসব। রিক্সায় যেতে যেতে দু'জনের মধ্যে তেমন একটা কথা হয় না। তবে একে অপরের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভঙ্গ করে শামীমা-মামুন আমার হাতটা একটু ধরতো। -মামুন নিঃসংকোচে শামীমার বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেয়। নরম আর বেশ উষ্ণ মনে হয়, সমস্ত পৃথিবী যেন বন্দি হয়ে আছে হাতের মধ্যে। হৃদয়ে কেমন একটা অজানা ঢেউ খেলে যায়। নাড়া খায় সত্তার ভেতরে। মামুন নিজের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকে মধ্য দুপুরের সূর্যের মতোই দেখতে পায়। চারপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে মামুন ভাবতে চেষ্টা করে এই ভয়াবহ ঘটনাটা কবে থেকে ঘটতে শুরু করেছে। গত দুই বছর একসাথে ক্লাস করা, ক্লাসের ফাঁকে আড্ডা মারা, নোট বিনিময় সবই হয়েছে এবং সেই সাথে বোধহয় পরস্পর পরস্পরের প্রতি গাণিতিক হারে দুর্বল হয়ে পড়ে। 'গাণিতিক হারে দুর্বলতা' কথাটা ঘুরপাক খায় মামুনের মাথায় ভেতর। তাহলে এতদিন আমরা প্রকাশ করিনি কেন? -ভালবাসা প্রকাশের একটা ভাষা ও সময় থাকে এবং সেই সময়ই বলে দেয় এখন কি হবে। মামুন নিজের ভেতর সাহিত্যিক যুক্তি খুঁজে পেয়ে চোখ ফিরিয়ে আনে শামীমার দিকে। কেন যেন বিষণ্ন সন্ধ্যার মতো মনে হয় শামীমার মুখ।

-হাতটা ছাড়, এইতো বাসস্ট্যান্ডে এসে পড়েছি। মৃদু কণ্ঠে বলে শামীমা।

মামুন নিজের ভেতর থেকে বিদায় দেয়ার কোন সাড়া পায় না। শামীমার মস্ত লাগেজ দু'টি দু'হাতে ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় গাড়ীর দিকে। বাসস্ট্যান্ডের প্রচণ্ড হৈ-হল্লা, সিগারেটওয়ালার চিৎকার, পান দোকানদারের চেঁচামেচি কিছুই যেন স্পর্শ করে না মামুনকে। যন্ত্রের দৃষ্টিতে খুঁজতে চেষ্টা করে নির্দিষ্ট গন্তব্যের বাসের গায়ের লেখাগুলি।

-কোথায় যাবেন আপনারা? উৎসাহী কন্ডাক্টর ছোকরা জিজ্ঞাসা করে।

-মান্দা যাবো। মান্দার বাস কোনটা-রে? নীরস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে মামুন।

কিন্তু এতে কন্ডাক্টর ছোকরার উৎসাহ কমে না।

-মান্দার বাস ২ মিনিট আগেই ছেড়ে গেল। -আসুন, এই বাসে উঠুন, আধঘন্টার মধ্যেই ছেড়ে যাবে। কথাটা বলেই মামুনের হাত থেকে লাগেজ দু'টো নিয়ে উঠে যায় একটা ফাঁকা বাসের ভেতর। পিছে পিছে মামুন এবং শামীমা বাসটার মধ্যে উঠে পড়ে।

-ইস্! একদম ফাঁকা। বাস ভর্তি না হলে তো ছাড়বে না। কথাটা বলেই শামীমা ডান পাশের একটা ফাঁকা সিটে বসে পড়ে।

-মামুন, এদিকে আয়। আমার পাশে বস একটুক্ষণ। বাস ছাড়তে এখনো অনেক দেরি।

একা একা একটা মেয়ে এতদূর যাবে, কথাটা ভাবতেই খুব খারাপ লাগছে মামুনের। কোন কথা না বলে নিঃশব্দে গিয়ে বসল শামীমার পাশে।

-দেখ মামুন! আমার এখনই কেমন যেন মাথা ঘুরছে। বমি করতে করতে তো মরেই যাবো মনে হচ্ছে।

মামুন ভাল করেই জানে শামীমার বাস জার্নি সহ্য হয় না। বাস চলতে শুরু করার ২০ মিনিটের মাথায় জানালা দিয়ে মাথা বের করে দিয়ে শব্দ করে বমি করতে শুরু করবে। মামুন কিছুটা চিন্তাযুক্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলো,- কি করা যায় বলতো? শামীমা কি যেন ভেবে হঠাৎ উজ্জ্বল মুখে মামুনের দিকে তাকালো। একরাশ উৎসাহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

-তুই কি আমার সঙ্গে সান্তাহার পর্যন্ত যাবি? তাহলে চল ট্রেনে যাই।

-কিন্তু সে-তো বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আর তাছাড়া সান্তাহার পৌছাতে পৌছাতে সন্ধ্যা লেগে যাওয়ার কথা। সান্তাহার থেকে তোর বাড়ির রাস্তা কতদূর। মামুন জিজ্ঞাসা করে শামীমাকে।

-বেশী না, গাড়িতে ওখান থেকে ৩০-৩৫ মিনিট লাগবে। একেবারে আমাদের বাড়ির পাশে নামিয়ে দেবে।

-এখান থেকে সান্তাহারের ট্রেন ছাড়বে কয়টায়? দেখতো শামীমা ঘড়িটা। কথা বলে শামীমা নিজের মধ্যে উপকারী পরুষের কঠিন সিদ্ধান্তকে দেখতে পায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আনন্দিত কণ্ঠে বললো শামীমা -এইতো আর মাত্র ১৫ মিনিট পরে একটা আন্তঃনগর ট্রেন ছেড়ে যাবে। সামনে থেকে লাগেজ দু'টো দু'হাতে ধরে হর-হর করে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল মামুন। পেছনে পেছনে শামীমা। কন্ডাক্টর ছোকরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো, ওদের দু'জনকে ওভাবে নেমে হন হন করে রেল স্টেশনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে।

-কত কিছিমের মানুষই আছে দুনিয়ায়, আল্লাহই জানেন। হয়তো মনে মনে ভাবে কন্ডাক্টর ছোকরা। আন্তঃনগর ট্রেন 'বরেন্দ্র' শাঁ শাঁ করে ছুটে যাচ্ছে তার নির্দিষ্ট গন্তব্য দিনাজপুরের দিকে, ট্রেন আজকে অনেকটা ফাঁকা। লোকজন তেমন একটা নেই। জানালার ধারে বসেছে শামীমা। পাশেই মামুন। মামুন একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে টানতে থাকে। কিছুটা চিন্তিত। হুট করে চলে আসলাম ঝোঁকের মাথায়। এখন আবার ফিরে আসবো কিভাবে?

-যাক, ওখান থেকে লাস্ট ট্রিপের বাস ধরে চলে আসা যাবে। মামুন ঝেঁটিয়ে এসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে। বর্তমান সময়টাকে উপভোগ করা দরকার।

ট্রেনের ঝিক্‌ঝিক্ শব্দের সাথে গাছ-পালা, ক্ষেত-খামার, গ্রাম-গঞ্জ, বিভিন্ন হাট-বাজার এবং সেইসাথে রৌদ্রের আলো-ছায়ার খেলা সবই পেছনে পড়ে যাচ্ছে। কাঁধে প্রেয়সীর ঘুরে চুল চুল মাথা যেন-অর্ফিয়ূসের বাঁশরী ছাড়া জাগবে না।

রাত ১টা। হোটেল অবসরের টু সিটেড রুমে মামুনের হাত শক্ত করে ধরে রেখে ফিস ফিস করছে শামীমা। দু'জনেরই চোখে-মুখে একটা অস্বস্তি এবং অপরাধবোধের অস্পষ্ট ছায়া দেখা যাচ্ছে। কিন্তু

কেউ কাউকে সেটা বুঝতে দিতে চাইছে না! মামুনের ইচ্ছের ডানা মেলতে চায়। নিজেকে ছড়িয়ে নিয়ে খাটের উপর বসল শামীমা।

-এটা কি করলাম আমরা! নিচের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলে শামীমা।

-দেখ শামীমা, এই নিয়ে কথাটা তুই তিনবার বললি। আমাদের আর কি-ই করার ছিলো, বল। আমি ঈশ্বর হলে না, মালগাড়ির বগিকে লাইনচ্যুত হতে মানা করতাম এবং তুইও নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যেতিস তোর বাসায়।

ট্রেন লেট হওয়ার কারণটা আবার মনে পড়ে গেল মামুনের। ক্রসিং-এর সময় একটা মালগাড়ির বগি হঠাৎ লাইনচ্যুত হয়ে পড়ে যায়। সেটা ঠিক করে সরিয়ে নিতে প্রায় ৬ ঘণ্টা দেরি। আন্তঃনগর ট্রেনটি যখন সান্তাহার পৌঁছালো তখন ঘড়ির কাঁটা রাত বারোটা ছুঁই ছুঁই করছে। অনেক আগেই মান্দার উদ্দেশ্যে শেষ বাসটি ছেড়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত সীমাহীন অস্বস্তি নিয়ে হোটেলের খাতায় 'ভাই-বোন' শব্দ দু'টি এবং ভুয়া নাম ঠিকানা লিখে, বুকের মধ্যে ভয় এবং রাতের শিহরণের শব্দ শুনতে শুনতে উঠে এসেছে হোটেলের কক্ষে।

-শোন শামীমা এটা নিয়ে এত চিন্তা করার কিছুই নেই। কথাটা বলেই শামীমার পাশে গিয়ে বসে মামুন এবং কাঁধের উপর ডান হাত দিয়ে নিজের দিকে টান মারে। কোন কথা না বলে শামীমা মাথা রাখে মামুনের কাঁধে। নিশুতি রাতের শব্দ ছাড়া কোন আওয়াজ শোনা যায় না।

-ঠক্ ঠক্ ঠক্। মনে হয় হাতুড়ির আঘাত পড়ছে দরজায়। লাফিয়ে দু'জন দু'দিকে সরে যায় এবং অগোছালো কাপড় ঠিক করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আবার শব্দ হয় নকের। অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠে দু'জনের বুক।

-কে? জিজ্ঞাসা করে মামুন।

-আমি হোটেলের লোক, দরজা খোলেন।

মামুন গিয়ে দরজা খোলে। চোখ-চমকে উঠে মনে মনে। গম্ভীর মুখে বসন্তের দাগওয়ালা একজন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, পেছনে আরো দু'জন।

-কি ব্যাপার! এত রাতে ঘুম থেকে ডেকে তোলার মানেটা কি? মামুন কণ্ঠে ঘুম ভাঙার কর্কশতা আনার চেষ্টা করে।

-আছে। ব্যাপার আছে- আপনি একটু বাইরে আসেন। পেছনে তাকায় মামুন। শামীমা লেপ গায়ে দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে ভীত হরিণীর মতো শংকিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

-কি বলবেন এখানেই বলেন।

-না, বলছি তো বাইরে আসেন। খেকিয়ে উঠে বসন্তদাগওয়ালা।

-তুই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বসে থাক। দেখি ইনারা কি বলতে চায়। মামুন ওদের সাথে বাইরে এসে এসে দাঁড়ায়।

-আসুন। বলে করিডোর দিয়ে তিন রুম বায়ে ফাঁকা একটা রুমে গিয়ে ঢোকে। মামুন কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়ায় ফাঁকা রুমটার দরজায়।

-ভেতরে আসুন, বসুন ওখানে।

কোন শব্দ না করে বসে পড়ে মামুন। চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকায় ওদের দিকে। এক মুহূর্ত কেটে যায় নীরবতায়। গলায় আলগা একটা গম্ভীরতা ফুটিয়ে প্রশ্ন করে বসন্তদাগওয়ালা

-আপনাদের মধ্যে সত্যিকারের সম্পর্ক কি বলেন তো?

-আমাদের মধ্যে সম্পর্ক যা সেটাতো খাতায় লেখাই রয়েছে। তার জন্য এত রাতে জিজ্ঞাসাবাদের

মানেটা কি? রেগে ওঠার চেষ্টা করে মামুন।

-আস্তে, আস্তে কথা বলুন। পাম থেকে ১৮-১৯ বছরের ফিনফিনে পাতলা গোঁফ উঠা ছেলেটা ঠাণ্ডা গলায় বলে।

-আপনারা যে ভাই-বোন না সেটা এখনি মেডিকেল চেকআফ করলেই প্রমাণিত হয়ে যাবে।

-কি বলতে চান আপনারা? একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে উঠে দাঁড়ায় মামুন। দরজার কাছে দাঁড়ানো বসন্তদাগওয়ালাকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। পেছন থেকে তিনজন এসে ওকে ঘিরে দাঁড়ায়। একটা অজানা ভয় কাবু করে ফেলতে চাইছে মামুনকে। কিন্তু সেটা বুঝতে না দিয়ে সামনে দাঁড়ানো বসন্তদাগওয়ালার কাঁধের উপর হাত রেখে চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলো- who are you? মালিককে ডাকুন তার সাথে কথা বলবো।

-আমি মালিকের ছোট ভাই। আর মনে হয় না আপনার বেশি কিছু বলার আছে। হাতটা ঝটকা মেরে সরিয়ে ব্যঙ্গেও সুরে বলল বসন্তদাগওয়ালা।

-আমাদের হোটেলের তালিকা প্রতি রাতে পুলিশ এসে চেক করে যায়। সত্য কথা না বললে পুলিশের হাতে তুলে দেবো। পাশ থেকে বলে উঠলো ভালো মানুষ টাইপের লোকটি যে এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। মামুন বুঝলো আর ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ নেই গ্যাড়াকলে পড়ে গেছে সে। মরিয়া হয়ে আরেকটা মিথ্যা গল্প বললো সে।

-শুনুন, আমরা আসলে চাচাতো ভাই-বোন। স্কুল জীবন থেকে প্রেম করি। বোনের বাসা দিনাজপুর থেকে আসছি। আমরা রাজশাহী কলেজে লেখাপড়া করি এবং ওখানেই যাচ্ছিলাম। পথে ট্রেন লেট হওয়ায় এখানে এসে উঠেছি। আর এছাড়া আমাদের কোন উপায় ছিল না। মামুন কথাগুলো বলে সহানুভূতি পাওয়ার আশায় ওদের দিকে তাকালো।

-এখন আপনারা কি বলতে চান?

তিনজনের চোখে মুখে কোন দয়া-মায়ার চিহ্ন নেই। পাথরের মতো মুখে বসন্তদাগওয়ালা বললো,

-পাঁচ হাজার টাকা দ্যান সারারাত আপনাদের কেউ কিছু বলবে না। একটু চিন্তা করে মামুন। হুট করে চলে আসাতে সাথে টাকা পয়সা তেমন নেই। শামীমার কাছে কিছু থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু ওদের দাবী মতো মেটানো কোনভাবেই সম্ভব হবে না।

-'দেখুন' বুঝানোর ভঙ্গিতে বলে মামুন। আমরা লেখাপড়া করি। এত টাকা! একটা অবাস্তব দাবি করছেন আপনারা।

-টাকা না দিতে পারলে দাবি মেটানোর আরো রাস্তা আছে। চিবিয়ে বললো বসন্তদাগওয়ালা। তার কথা বলার ভঙ্গি এবং ইঙ্গিত দেখে মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়ল,

-কি বললি শুয়োরের বাচ্চা!

মামুনের চিৎকারে দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে শামীমা। সে মামুনের লাল চোখ মুখ দেখলো। উত্তেজনার মৃদু কাঁপছে সে। চোখে মুখে ভয় এবং ঘৃণার সংমিশ্রণ। কিছু একটা অনুমান করে নিলো শামীমা। সে মামুনের পাশে এসে দাঁড়ালো।

-কি হয়েছে মামুন তুই এরকম করছিস কেন? আমাকে বল! কান্নায় ভেঙে আসতে চাইছে যেন শামীমার কণ্ঠ।

-শামীমা, তোকে বাইরে আসতে বলেছে কে? ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দে।

-না আমি যাবো না। আমাকে বল কি হয়েছে? তিনজন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে শামীমার দিকে। মামুনের মাথার ভেতর পালানোর তাগিদ অনুভূত হচ্ছে! যে করেই হোক পালাতে হবে এদের হাত থেকে। শামীমার হাতে অলক্ষ্যে চিমটি মেরে দরজা দেখালো মামুন। ওর চোখে মিনতি দেখে ধীরে ধীরে দরজার দিকে হঠতে লাগলো শামীমা। মামুন মনে মনে হিসাব করে নিলো দরজার দূরত্ব দশ কদম।

-শুনুন আপনারা এদিকে আসুন। আপনাদের প্রস্তাবে আমি রাজী আছি তবে ...

ওদের কিছু বুঝতে না দিয়ে ঝটকা মেরে মাঝের জনকে সরিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিলো দরজা লক্ষ্য করে। শামীমা ততক্ষণে পৌঁছে গেছে খোলা দরজার কাছে। ওকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলো ছিটকিনি। এতক্ষণে সম্বিত ফিরে পাওয়াতে দৌড়ে এসে জোরে জোরে নক করতে শুরু করেছে দরজায়।

-শামীমা খাটটা ধর তাড়াতাড়ি। খাটটা নিয়ে ধরাধরি করে মুহূর্তের মধ্যে লাগিয়ে দিলো দরজায়।

-লাইট বন্ধ কর শিগগির, শামীমা লাইটের সুইচ অফ করে দিলো। দরজার একপাশে ছোট ছোট দুটো ফুটো সেখান দিয়ে করিডোরের আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। এতক্ষণে রুমের ভেতর চোখ রাখার রহস্য পরিস্কার হালো। বাইরে থেকে বসন্তদাগওয়ালার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে।

-আমরা পুলিশের কাছে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চালাকি করার মজা বুঝবি।

মামুন মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করলো। এখনো রাত অনেকখানি রয়েছে। যা করার পুলিশ আসার আগেই করতে হবে। পুলিশ এদের থেকেও ভয়াবহ। কিন্তু কিভাবে! মামুন পেছনের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। পাশ দিয়েই রাস্তা। ভালভাবে পরীক্ষা করলো জানালাটা। মজবুত গ্রিল শক্ত স্ক্রু দিয়ে লাগানো। জানালার দু'হাত দিয়ে শক্ত করে গ্রিল ধরে ঝাঁকি দিলো মামুন। কিন্তু নিজের অবস্থানচ্যুত হওয়া ছাড়া কোন লাভ হলো না।

বাইরে শোনা যাচ্ছে পুলিশের গাড়ির সাইরেণ। এগিয়ে আসছে ওরা। বুটের খট্ খট্ শব্দের সাথে দরজায় এসে দাঁড়ায় পুলিশ। মামুন শামীমার দিকে তাকায়। তার মনে পড়ে যায়, থানার গারদে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা সীমা চৌধুরীর কথা।

হরতাল

আসমাউল হুসনা মনি
শিক্ষার্থী, মার্কেটিং বিভাগ, বেরোবি

যাত্রা তব শুভ হোক। জননী ও তনয়ার বিদায়লগ্ন। গ্রাম বাংলার মফস্বল পল্লী। শীতের ভোর। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মত শিশির ঝরছে। ফজরের আযান শোনা যাচ্ছে। কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে ৬০ বছরেরও বেশী বৃদ্ধ আজান দিচ্ছে। পাখিদের কিচির মিচির ডাক আর মাঝে মাঝে বাঁশ বাগানের এক গাছ থেকে আর এক গাছে বাদুড়ের লাফিয়ে যাওয়ার ঝাপটা। যাত্রা রাজধানী ঢাকার উদ্দেশ্যে।

সেই তনয়াকে দুই ক্রোশ পাড়ি দিয়ে বাস ধরতে হবে। বাসের টিকিট করা হয়নি। কারণ এমন কেউ নেই যে তার টিকিট এনে দেবে। পিতা আমজাদ হোসেন নেশাখোর। জন্মদাতাকে নেশাখোর বলা যায় না। অবশিষ্ট যে বসতিভিটেটুকু ছিল তাও বন্ধক দিয়েছে।

পরমাত্মার লীলাখেলায় বসুধার বুকে এই দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম। তনয়ার জননী যখন আমজাদ হোসেনকে বিয়ে করেছিল তখন তাদের বসতভিটে ছাড়াও ৬ শতক জমি ও গোয়ালভর্তি গরু-ছাগল ছিল। আমজাদ হোসেনের কর্মের কারণে যখন শেষ সম্বল বসতভিটেটুকু বিদ্যমান তখনই তনয়ার বসুধায় আসার পূর্বপ্রস্তুতি পর্ব।

তনয়ার জননীর গর্ভকালীন সময়ের প্রয়োজনে আমজাদ হোসেনের শ্বাশুড়ি তাকে কিছু টাকা দিয়েছিল। বসুধার বুকে আসার পূর্বে তনয়ার জননী যখন গর্ভব্যথায় কাতর তখন তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়ার জন্য শুভ যাত্রা শুরু হয়।

হাসপাতাল কয়েক কি. মি. দূরে অবস্থিত। গাড়ি ভাড়া করার সামর্থ্য না থাকায় তাদের লোকাল বাসে করেই যেতে হবে। ভ্যানগাড়ি যখন বাসস্টান্ডে পৌঁছাল তখন শোনা গেল আজ হরতাল, গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ। তাই পুনরায় ভ্যানগাড়িকে অবলম্বন করে যাত্রা শুরু হল হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। হাসপাতালে পৌঁছানোর সামান্য পূর্বেই প্রকাণ্ড এক বকুল গাছের ছায়ায় জন্ম হল তার। নাম দেয়া হল বকুল।

জীবনের সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে যখন বকুল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে তখন আমজাদ হোসেন তাকে টাকার লোভে বিয়ে দেয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। পাত্র স্থির করা হয়েছে রাজদরবার ছাড়া এক রাজপুত্রের সাথে। রাজপুত্রের কর্মবৃত্তি অবহিতর কারণে বিয়েতে তনয়ার জননীয় অমত।

যাত্রার উদ্দেশ্য একটি প্রতিষ্ঠানের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। ঘরে মোবাইল ফোন নেই, পোস্ট মাস্টারের দেয়া এক চিঠি থেকে জানতে পেরেছে তাকে আগামী পরশু প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাতে হবে। এটাও সম্ভব হয়েছে মাস্টার মশাইয়ের এক আত্মীয়ের সহায়তায়। আমজাদ হোসেন আজ রাতে বাড়ি ফিরে নি। এ নিয়ে মা ও মেয়ের মুখে চিন্তার কোন চিহ্ন নেই। কারণ এটাতেই তারা অভ্যস্ত। বরং আজ সুবিধেই হয়েছে। কারণ আজ তার তনয়ার যাত্রা পথে কোন বাঁধা আসবেনা।

যখন আকাশ ব্যস্ত সূর্য ওঠা নিয়ে, তনয়া ব্যস্ত তার তার স্বপ্ন এবং মায়ের মুখে হাসি ফোটানো নিয়ে। সেই মুহূর্তে বুকভরা আশা নিয়ে সে পৌঁছেছে বাস কাউন্টারে। দু-একজন মানুষ ছাড়া কোচস্টান্ড জনশূন্য। কারণ আজকের দিনটিও সেই হরতাল। হাতের নাগালের মধ্যে ডিজিটাল কোনকিছু না থাকায় জানতে পারেনি দু'দিন হরতাল।

তার স্বপ্ন, মায়ের মুখের হাসি সবকিছু এই হরতালের কারণে নদীভাঙ্গনের মত চুরমার হয়ে গেল। তার স্বপ্ন হয়েছে স্তিমিত। তাই সে আবার অশুভ যাত্রা শুরু করছে দারিদ্র ও ক্ষুধায় ভরা সেই বন্ধকী বাড়িতে।

বাড়ির উঠানে পা রাখতেই দেখতে পায় তার হবু বর চেয়ারে বসে পানের পিক ফেলছে। বকুলের সামনে সব পথই অবরুদ্ধ। হয়তো তাকে বিয়ে করতে হবে সেই ৬০ বছরের রাজপুত্রকে। তাই অবশেষে চোখ বন্ধ করে এবং হরতালকে দায়ি করে তার সব স্বপ্ন আশাকে তুলে দিল পরমাত্মার সেই নির্মম নিয়তির উপর।

পরীর মা

আফিফা ইশরত চেতনা
শিক্ষার্থী, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, বেরোবি

ছোট্ট মেয়ে অন্বেসা- সবে এবছর থেকে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। সে স্কুলে যায় পরীর মায়ের সাথে আবার ফেরেও তার সাথেই। বাসায় তার সারাটা দিন কাটে পরীর মায়ের কাজে বাধা সৃষ্টি করে। পরীর মায়ের সাথে নানান রকম খুনসুটি করেই চারদেয়ালের ভিতর সময় কাটে অন্বেষার। চাকরীজীবী বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান অন্বেষা, এছাড়া আর কিভাবেই বা সময় কাটাবে? কর্মব্যস্ত এ শহরে আত্মীয়-স্বজন বা পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে তার যে কালেভদ্রে দেখা হয়।

সন্ধ্যের পর অন্বেষা পড়তে বসে মায়ের কাছে। যদিও অফিস থেকে ফিরে এসময় তিনি ক্লান্ত থাকেন তবুও চান নিজেই মেয়েকে পড়াতে। আর দিন শেষে মায়ের সান্নিধ্য যে অন্বেষার কাছে পরম আরাধ্য। এই সময়টায় অন্বেষার বাবা পেপার পড়া আর মেইল চেক করার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় ফোন কলগুলো সেরে নেন। অন্বেষার পড়া শেষ হলে সবাই একসাথে রাতের খাবারটা খেয়ে নেয়। আর মা পরীর মাকে আগামীদিনের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে চিন্তামুক্ত হন; কারণ পরীর মা এত গুছিয়ে সব কাজ করে যে তাকে আর কোন চিন্তা করতে হয় না। আর এজন্যই তিনি অন্বেষাকে একটু সময় দিতে পারেন আর বিশ্রাম নিতে পারেন। অন্বেষা আজকাল ঘুমোয় তার নিজের নতুন ঘরে আর বাবা-মা তাদের নিজস্ব ঘরে। আর পরীর মায়ের রাত কাটে ড্রয়িং রুমের মেঝেতে মাদুর পেতে।

সাত সকালেই তাড়াহুড়ো করে অফিসে চলে যেতে হয় বাবা-মাকে। অন্বেষার স্কুল বসে একটু দেরিতেই। তাই তার সকালটা শুরু হয় পরীর মায়ের সাথেই। পরীর মা তাকে ঘুম থেকে তুলে নাশ্‌তা খাইয়ে, স্কুলের জামা-জুতো পরিয়ে, টিফিন তৈরি করে বাড়িতে তালা মেরে স্কুলে নিয়ে যায়, আবার ছুটির পর নিয়ে আসে। বাড়ি ফিরে অন্বেষাকে কিছু খাইয়ে কাজ সারতে থাকে পরীর মা। দুপুরের খাওয়ার সময় হলে তাকে খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে বাকি কাজ সারে পরীর মা।

অন্বেষা পরীর মাকে 'পরীর মা' বলেই ডাকে যদিও তার মা তাকে অনেকবার বলতে বলেছে পরীর মা তার চেয়ে বয়সে বড় তাই তাকে খালা বলে ডাকতে। কিন্তু কথা শোনেনি সে বরং বড়দের মত পরীর মা বলেই ডেকে চলেছে-পরীর মা, তোমার সাথে খেলব, পরীর মা, আজ আমি স্কুলে যাব না; পরীর মা, আজ মাছ খাব না মাংস খাব; পরীর মা, গল্প শুনব- এভাবে পরীর মা, পরীর মা করেই তার দিন কাটে। পরীর মাও হাসি মুখে তার সকল আবদার মেনে নেয়, কখনই বিরক্ত হয় না। তবে অন্বেষার কোন অন্যায় আবদারকে সে প্রশ্রয় দেয় না; বরং তাকে বুঝিয়ে বলে আর অন্বেষা ও লক্ষী মেয়ের মত মেনে নেয় তার কথা।

একদিন দুপুরে অন্বেষাকে গল্প বলে ঘুম পাড়াচ্ছিল পরীর মা। চোখ বন্ধ করে গল্প শুনতে শুনতে হঠাৎ অন্বেষা তাকে জিজ্ঞেস করল, - "পরীর মা তোমার নাম কি?" গল্প বলা থামিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে রইল পরীর মা। নাম? তার আবার আলাদা কোন নাম আছে নাকি? একটু থমকে থেকে সে উত্তর দিল- "আছিয়া"। অন্বেষা তখন বলল, - "এখন থেকে তোমাকে আমি আছিয়া খালা বলে ডাকব।" জবাবে কিছুই বলতে পারল না পরীর মা। হ্যাঁ পরীর মা। সেতো এখন পরীর মাই হয়ে গেছে। আছিয়া আর নেই।

সেই রাতে ড্রইং রুমের মেঝেতে শুয়ে ক্লান্ত শরীরেও ঘুম আসেনা পরীর মায়ের; সে ফিরে যায় তার অতীতে। মাত্র তের বছর বয়সে বিয়ে হয় পরীর মায়ের আর তখন থেকেই মুছে যায় বাবা-মায়ের দেওয়া আছিয়া নামটি। পরীর জন্মের পর থেকেই আর পরিচয় পরীর মা। পরীর কথা ভাবে সে। ভয়ঙ্কর বন্যা কেড়ে নেয় তার পরী আর পরিবার-পরিজনকে। তার কাছ থেকে তার পরী হারিয়ে গেলেও হারিয়ে যায়নি তার পরীর মা নামটি। পরী না থাকলেও পরীর মা নামটি জড়িয়ে আছে তার জীবনের সাথে।

আচ্ছা, পরীর মা নামটা কি তার খারাপ লাগে? কই, না তো। বরং এ নামটি তাকে মনে করিয়ে দেয় তার সন্তানের কথা, মনে করিয়ে দেয় যে সে একজন জননী।

সন্তানের নামে পরিচিত হওয়া মন্দ কি? তবে কি অন্বেষা তাকে আছিয়া খালা বলে ডাকলে তার খারাপ লাগবে? মনে তো হয় না। তার জীবনে এ নামটিরও প্রয়োজন আছে। কারণ, পরীর মা নামটি তার অহংকার, তার গর্ব হলেও আছিয়া নামটি যে তার অস্তিত্বের প্রমাণ, তার আপন সত্তা।

অন্তঃ ক্ষরণ

আব্দুল্লাহ
শিক্ষার্থী, একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ, বেরোবি

৮ম শ্রেণীর ফলাফল প্রকাশ হয়েছে, অতুল ও জিতু গ্রামের পথ ধরে বাড়ি ফিরছিল। অতুলের মুখে হাসি নাই। অতুল ও জিতু খুব ভাল বন্ধু। আর আমি ছিলাম ক্লাসে সবচেয়ে দুষ্টু, নাম আমার মন্টু। জিতু ক্লাসে প্রথম আর অতুল ৪৯তম। এতে অতুলের মনে কোন কষ্ট নেই, বরং বন্ধুর সাফল্য তার মনে আনন্দের জোয়ার এনে দিয়েছিল। তার ভয়ের কারণ ছিল জমের মত মামা মামী। মা-বাবাহীন অতুল মামার বাড়ীতে থাকতো, মামা মামীর নিদারুন অবহেলা সহ্য করতে হত তাকে। কখনো কখনো কষ্ট সহ্য করতে না পেয়ে নদীতে ডুবে মরতে চাইত। অতুল ভাল লিখতে পারত, তার মগ্ন ছিল লেখক হবার। বেশির ভাগ সময় সে আনমনা থাকত। সে জীবনকে দেখার জন্য নিয়মিত রেলওয়ে পষ্টিতে যেত। সেখানে মাতা-পিতাহীন শিশুদের মাঝে নিজেকে খুঁজতে।

একদিন সে নিজেকে খুঁজে পেল এক পঙ্গু অনাথ মেয়ের মাঝে। সে মেয়েটি তাকে জীবনীশক্তি দিয়েছিল, যুগিয়েছিল অসীম সাহস, শিখিয়েছিল যুদ্ধ করে বাঁচতে। নাম তার চন্দ্রা, যে কি না অতুলের জীবনের পূর্ণিমার মত এসে অমাবস্যার মত চলে গেছে। চন্দ্রার ছোট দুটি ভাই বোন অপেক্ষা করে আছে বুবুজি কখন আসবে, তাদের মুখে আদর করে দু'মুঠো ভাত তুলে দেবে। এ যেন অপেক্ষা নয় সংযমের মহামুর্তি। তাড়াতাড়ি আসতে গিয়ে চন্দ্রার পা আটকে পড়ে রেল-লাইনের ফাঁকে। নিরুপায় মেয়েটির চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছিল। নিজের জন্য নয় ছোট ভাইবোনদের জন্য।

এ সংকটময় অবস্থায় সাহায্যদূত হয়ে এগিয়ে এলো অতুল। মেয়েটি তখন ভয়ে কাঁপছিল। অতুল চন্দ্রাকে তার বাড়িতে পৌছে দিল এবং শুনতে পেল তাদের জীবনের অদ্ভুত সব মিল। চন্দ্রা দেখতে চাঁদের মত না হলেও তার মন ছিল আকাশের মত উদার, যেখানে কোন নিচুতার ছোঁয়া লাগেনি। অতুল সবসময় চন্দ্রার কথা ভাবতে লাগলো। খুঁজে পেল তার জীবনের আসল ঠিকানা। অতুল নিয়মিত তাদের খোঁজ-খবর নিতে থাকলো। চন্দ্রা বুঝতে পারলো অতুলের না বলা কথা। চন্দ্রা অতুলকে বলল, তুমি কি পারনা সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে।

অতুল এবার নতুন উদ্যোগে সবকিছু শুরু করল। চন্দ্রার অনুরোধে মামার বাড়ি ছেড়ে চন্দ্রাদের বস্তিতে উঠল। অতুল চন্দ্রার ভাইবোনদের পড়াত এবং নিজে পড়ত। আর চন্দ্রা অন্যের বাড়িতে কাজ করে দু'বেলার খাবার জোটাত। চন্দ্রার কষ্ট অতুলের সহ্য হতোনা। সে নিজে কাজ করতে চায়। কিন্তু চন্দ্রা বলত, তুমি তো আমাদেরই, তুমি অনেক বড় হবে, বড় চাকরি করবে, আমাদের আর কোন কষ্ট থাকবে না। শত কষ্টেও চন্দ্রা হাসিখুশি থাকতো। নিজে না খেয়ে অতুলকে খাওয়াতো।

সন্ধ্যাবেলা চন্দ্রা অতুলের জন্য ডাল-মুট ভেজে দিত। অতুলের পড়ার টেবিলের পাশে বসে থেকে অতুলকে বাতাস করত। অতুল না ঘুমানো পর্যন্ত চন্দ্রা জেগে থাকতো। চন্দ্রা ভোরবেলা উঠে অতুলকে জাগিয়ে দিয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে যেত। অতুল কেঁদে ফেলতো, আর ভাবতো সৃষ্টিকর্তা মানুষের মধ্যে এত প্রেম দিতে পারে, চন্দ্রাকে না দেখলে বোঝাই যেতো না।

চন্দ্রা অতুলের সমস্ত হৃদয় জুড়ে বিস্তৃত হতে লাগলো। অতুল ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত 'হে প্রভু পুনর্জন্মের সময় তুমি আমাকে চন্দ্রা আর চন্দ্রাকে আমার মত করে সৃষ্টি করিও যাতে আমি কিছুটা হলেও তার ঋণ শোধ করতে পারি।'

চন্দ্রা রবিবার কাজে যেতনা, তারা বেড়াতে যেত দূর নদীর ধারে। চন্দ্রা সাথে ডাল-মুট ভেজে নিতে ভুলতো না। চন্দ্রা প্রায় আনমনা হয়ে বলে উঠত, আমি যদি নদী হতাম আর তুমি হতে সাগর তাহলে

আমি অনন্তকালের জন্য তোমার মাঝে বেঁচে থাকতাম– বলে কেঁদে ফেলতো, অতুল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিত আর চোখের জল মুছে দিত।

অবশেষে চন্দ্রার কষ্ট সফলতার মুখ দেখতে শুরু করলো। অতুল একেএকে বি,এ ডিগ্রী পাশ করলো। এবং ভালো রেজাল্টের কারণে খুব তাড়াতাড়ি চাকরি পেল। চন্দ্রা হৃদয়ের কান্না চেপে রেখে হাসি মুখে বিদায় দিল আর একটি কথা বলল-পত্র দিও সময় পেলে। অতুল কিছুই বলতে পারলো না, শুধু চন্দ্রার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল– আসি।

আমি বেশিদূর লেখা পড়ার করতে পারিনি। নিম্নমাধ্যমিক পাশ করে বাবার ডাকপিয়নের চাকরিটা নিয়েছিলাম। শহরে গেলে মাঝে মাঝে অতুলের সাথে আলাপ হত। অতুল আমাকে তার সব কথা বলত। অতুল কর্মক্ষেত্রে গিয়ে শত ব্যস্ততার মাঝেও চন্দ্রাকে পত্র দিত। বেতনের এক সপ্তাহ আগে অতুল চন্দ্রাকে জানালো আমি বাড়ি ফিরছি তোমার জন্য লাল টুকটুকে শাড়ি নিয়ে (চন্দ্রার শীর্ণ বস্ত্র অতুলের চোখে জল এনে দিল) তুমি লাউ গাছটার যত্ন নিও, কতদিন তোমার হাতে রান্না করা লাউডাটার ঝোল খাইনা।

এ সময় দেশে রাজনৈতিক পালাবদল হয়, পরিবর্তন হয় সরকারের। শুরু হয় বস্তি দখলের নির্মম প্রতিযোগিতা। অতুল বুক ভরা আশা নিয়ে বাড়িতে ফিরে নির্বাক হয়ে যায়। মরুভূমি সদৃশ্য বস্তি তার হৃদয় বিদীর্ণ করে দেয়। বস্তির অবস্থা ও তার হৃদয় যেন এক হয়ে যায়। কোথাও কোন বাড়িঘরের আকার খুঁজে পাওয়া যায়না, শুধু দেখতে পায় সেই জীর্ণশীর্ণ লাউগাছটি। অতুল লাউগাছটি জড়িয়ে ধরে 'চন্দ্রা' বলে আর্তনাদ করে ওঠে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

GH গিনি হাউস
Gini House
স্থাপিত-১৯৪৯
উন্নতমানের অলংকার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

কালেক্টরেট বিপণী বিতান
দোকান নং-১০৬
বেতপট্টি রোড, রংপুর।

মোবাইল : ০১৬৭১-৩৮২৫৪৪
দোকান : মোবা : ০১৮১৯-৮৬৮২৩১
দোকান : ফোন : ০৫২১-৬৩২৫৫

গুনগুন পরিবার

নির্বাহী কমিটি:

উমর ফারুক, সভাপতি
আফিফা ইশরত চেতনা, সাধারণ সম্পাদক
আবু হুরাইরা রাকিব, সাহিত্য সম্পাদক
তানজিমা হক, অর্থ সম্পাদক
বিভূতী ভূষণ মাহাতো, প্রচার সম্পাদক
মোঃ সোহানুল হক, ক্রীড়া সম্পাদক
মোঃ তৌহিদ নূর শাফি, সদস্য
নওরীন তাসনুমান, সদস্য
আলপনা আকতার জাহান, সদস্য

সদস্য:

মোঃ ফরিদুল ইসলাম সোহাগ
মোঃ ফিরোজ আলম
আব্দুল গফুর তপু
ফারজানা হাবীব প্রীতি
এলিজা হক লিজা
স্নিগ্ধা আক্তার
ইশরাত জাহান
মোঃ জাকির হোসেন
মোঃ সেলিম হোসেন
টুম্পা সরকার
পল্লব মিনজ্
মোঃ মোজাক্কের হোসেন
অনিন্দ্য
সুপ্রিয়া কুন্ডু
রাজিয়া খাতুন
আফরোজা বেগম
ফাল্গুনী রায়

ফ্যাশন যেখানে
আমরা সেখানে

যে কোন উৎসবে পরিবারের কেনা-কাটার জন্য
আনন্দমুখর পরিবেশের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
মায়া-র প্রতিটি শো-রুম।

মায়া শাড়ি ঘর
জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা, ক-২১০,২১১ রংপুর। ফোনঃ ৬৩৮৪২
এখানে পাবেনঃ কাতান, বেনারসী, জামদানী, শিফন, জর্জেট, মসলিন, টিস্যু, টিস্যু সিল্ক, টাংগাইল সিল্ক, রাজশাহী সিল্ক, লেহেঙ্গা ও অন্যান্য আকর্ষণীয় শাড়িসহ টাংগাইলের মোহনীয় সব তাঁতের শাড়ি।

মায়া বস্ত্রালয়
ক-২০৭,২০৮ জেলা পরিষদ সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা,রংপুর। ফোনঃ ৬৩৮৮২
এখানে পাবেনঃ স্যালোয়ার কামিজ, কাটা থ্রি-পিস্, স্কার্ট, টপস্, ফতুয়া, পাঞ্জাবী, টি-শার্ট ও ছোট ছেলেমেয়েদের আকর্ষণীয় সবধরণের পোশাক।

মায়া এক্সক্লুসিভ ফ্যাশন হাউস
পায়রাচত্তর সেন্ট্রাল রোড, অগ্রণী ব্যাংক প্রধান শাখার সামনে।
ফোনঃ ৫৩২১০ মোবাইলঃ ০১৭৩৭৮৩৩২৪৪
এখানে পাবেন পরিবারের সবার জন্য পোশাক
পাঞ্জাবী, ফতুয়া, শার্ট, টি-শার্ট, প্যান্ট, জিন্স, স্যালোয়ার-কামিজ, কাটা থ্রী-পিস্, স্কার্ট, টপস্, ছোট ছেলেমেয়েদের আকর্ষণীয় পোশাকসহ কাতান বেনারসী, জামদানী, শিফন, জর্জেট, মসলিন, টিসু, টিসু সিল্ক, লেহেঙ্গা ও অন্যান্য আকর্ষণীয় শাড়িসহ টাঙ্গাইলের মোহনীয় সব তাঁতের শাড়ি। আরও পাবেন- কস্‌মেটিকস্, ফ্যাশন জুয়েলারী, মেয়েদের স্যান্ডেল ও হ্যান্ড ব্যাগ।

পরিবারের সবার জন্য আমরা